প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

Proof-2

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি, 2021

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ডিসটেন্স এডুকেশন ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)
Semester : I PGJMC
কোর কোর্স - 1
CC-1 (জ্ঞাপন নীতি)

কনটেন্ট রাইটার (Content Writer)

ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর(সাংবাদিকতাওগণজ্ঞাপন)
মানববিদ্যা অনুষদ,
নেতাজি সুভাষ মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা (Editor)

প্রফেসর শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায় প্রফেসর,
গণজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বিন্যাসকরণ (Formating)

শ্রী অরিজিৎ ঘোষ
অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন), মানববিদ্যা অনুষদ,
নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর বিষয়ে সমিতি (PG Board of Studies)

অধ্যাপক শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়
প্রফেসর, গণজ্ঞাপন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান
ড: দেবজ্যোতি চন্দ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,গণজ্ঞাপন ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগ,
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
(সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন), মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মনন কুমার মণ্ডল
ডিরেক্টর,মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রী স্নেহাশিস সুর
প্রবীণ সাংবাদিক, দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা
ড: পল্লব মুখোপাধ্যায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
শ্রী অরিজিৎ ঘোষ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, (সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন),
মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

Semester : I PGJMC

কোর কোর্স - 1 CC-1 (জ্ঞাপন নীতি)

মডিউল - ১ : জ্ঞাপন ধারণা

একক-১ জ্ঞাপনের মাত্রা, বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন 7-11

একক-২ মৌখিক এবং অমৌখিক জ্ঞাপন 12-15

একক-৩ গনজ্ঞাপনের কাজ এবং উপাদান 16-20

একক-৪ গনজ্ঞাপনের প্রভাব-গনজ্ঞাপন এর বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য 21-27

মডিউল-২ জ্ঞাপন তত্ত্ব-১

একক-১ জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব,দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব
জ্ঞাপন পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব 28-33

একক-২ বিষয় নির্বাচন ও দ্বার রক্ষার তথ্য, উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব, ব্যক্তি প্রভাব তথ্য 34-38

একক-৩ বিভিন্ন তত্ত্ব: কর্তৃত্ববাদী, উদারবাদী, সাম্যবাদী গণমাধ্যম, সামাজিক দায়বদ্ধতা 39-41

একক-৪ উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব,গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব, কনভারজেন্স 42-46

মডিউল-৩ জ্ঞাপন তত্ত্ব-২

একক ১ জ্ঞাপন এর মডেল ধারণা, লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল
(রৈখিক এবং অরৈখিক মডেল) মৌখিক মডেল, আইকনিক মডেল, অ্যানালগ মডেল 47-52

একক ২. অ্যারিস্টোটল মডেল, লাসওয়েল মডেল, ওসগুড মডেল, স্ক্রাম মডেল, গাবর্নর মডেল 53-59

একক ৩ B.T মডেল, শ্যানন ওয়েভার মডেল, দে ফ্ল্যার মডেল, দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল 60-67

একক ৪ নিউকম্ব মডেল, ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল, ডান্স মডেল 68-71

মডিউল -৪ জ্ঞাপন প্রভাব তত্ত্ব

একক ১ ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব, ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব **72-76**

একক ২ স্পাইরাল অফ সাইলেন্স, জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব **77-81**

একক ৩ উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব, সাম্যবাদী তত্ত্ব, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য **82-91**

একক ৪ কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ **92-95**

একক ১ ◘ জ্ঞাপনের মাত্রা, বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন

গঠন

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ জ্ঞাপন

১.১.৩.১ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা

১.১.৩.২ বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন

১.১.৪ সারাংশ

১.১.৫ অনুশীলনী

১.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে জ্ঞাপন এর ধারণা পরিষ্কার হবে। তাহলে জানা যাক জ্ঞাপন বিষয়টি কি?

১.১.২ প্রস্তাবনা

এই একক জ্ঞাপন এর ধারণাকে আরও স্পষ্ট করবে। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

১.১.৩ জ্ঞাপন

জ্ঞাপন কী তা জানা জরুরী। জ্ঞাপন হলো তথ্যের আদান প্রদান এবং এই প্রক্রিয়া সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার।

জ্ঞাপন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন পারস্পরিক জ্ঞাপন, দলগত জ্ঞাপন, গণ জ্ঞাপন, এবং গণরেখ জ্ঞাপন।

পারস্পরিক জ্ঞাপন দুজন ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। যখন দুই বন্ধু কথা বলছে সেটি হলো পারস্পরিক জ্ঞাপন। একজন বলছে এবং অন্যজন শুনছে। একইভাবে অন্যজন বলছে আরেকজন শুনছে। তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা সহ এই জ্ঞাপন প্রতিনিয়ত চারপাশে ঘটছে।

দলগত জ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করে দুই এর অধিক ব্যক্তি। চেনা কয়েকজন বন্ধু কফি হাউজে আড্ডা মারছে, এ হলো দলগত জ্ঞাপন।

গন জ্ঞাপনে ঘটে বহু মানুষের অংশগ্রহণ। একটি পরিকল্পিত বার্তা নির্বাহের মাধ্যমের সাহায্যে লক্ষ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

গণ-রেখ জ্ঞাপন ঘটে বিখ্যাত নেতাদের বক্তৃতায়। মাও সে তুং, মহাত্মা গান্ধী, উইনস্টন চার্চিল শুধু বক্তৃতা দিয়েই মানুষের মনে গভীর পরিবর্তন এনেছিলেন। এই হল গণরেখা জ্ঞাপন।

১.১.৩.১ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা

পারস্পারিক তথ্য ভাবনার আদান-প্রদান হল জ্ঞাপন। আমাদের নিত্যদিনের বেঁচে থাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে জ্ঞাপন। দেহের ভঙ্গিমায়, মানুষের কথায়, গানের সুরে, লেখায়, ছবিতে ঘটে চলেছে এই জ্ঞাপন। জ্ঞাপন এর ইংরেজি শব্দ হল কমিউনিকেশন (communication) যা লাতিন ভাষা কমিউনিস (communis) থেকে এসেছে। Communis কথার অর্থ সাধারণ। ভাবনা এবং বার্তা যখন সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তখনই সেটি সার্থক জ্ঞাপন। Dennis McQuail বলেছেন ''communication is a process which increases commonality'' অর্থাৎ জ্ঞাপন হল একটি প্রক্রিয়া যা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়ায়। বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারার সময় একটি কমন ভাষা দরকার যেটা আমি এবং আমার বন্ধু বুঝি। Dennis McQuail জ্ঞাপন কে মানবিক বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন মানুষে মানুষে বোঝাপড়া, ভাবনার আদান-প্রদান ঘটে চলার মধ্যে দিয়ে সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে।

John C Merril and Ralph L Lowenstein বলেছেন জ্ঞাপন হলো দ্বিমুখী বার্তা। দুটি রাস্তা দিয়েই বার্তা প্রভাবিত হয়। একটি রাস্তা প্রেরকের থেকে গ্রাহকের দিকে যাবে। আরেকটি রাস্তা গ্রাহকের থেকে প্রেরকের দিকে আসবে। বোঝাপড়া নির্ভর করছে এই আদান-প্রদানের উপরে।

বিশ শতকের প্রখ্যাত গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Wilbur Schramm বলেছেন জ্ঞাপন হলো সাধারণ গ্রহণযোগ্যতার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। আমরা যখন জ্ঞাপন করি তখন বার্তা, ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করি। Schramm বলেছেন ''When we communicate we are trying to establish a commonness with someone'' বার্তা যাই হোক না কেন দু'জনকেই তা ভাগ করে নিতে হয়।

Colin Cherry বলেছেন জ্ঞাপন হলো উদ্দীপনা প্রেরণ এবং প্রতুত্তর তৈরীর প্রক্রিয়া (transmission of stimuli and evocation of response)। এর অর্থ হলো শুধুমাত্র বার্তা বিনিময় দিয়ে জ্ঞাপন হয়না, তাকে অবশ্যই উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাহক উদ্দীপিত হলেই তৈরি হবে প্রতিক্রিয়া যা তৈরি করবে প্রতুত্তর। এই ভাবেই জ্ঞাপন হয়ে ওঠে মানবিক।

George Gerbner জ্ঞাপন প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন জ্ঞাপন হল বার্তা বিনিময়ের মাধ্যমে সংগঠিত এক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Communication is social interaction through messages)। গণমাধ্যম যখন কোন বার্তা পৌঁছে দেয় পাঠক বা দর্শকের কাছে তখন তৈরি হয় এক সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাস, যার কোন স্থির রূপ

নেই, ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ হয়। জ্ঞাপন কাজে মানুষের অংশগ্রহণ যত বাড়ে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্র ততো প্রসারিত হয়ে মিথস্ক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করে।

১.১.৩.২ বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন

জ্ঞাপন বিভিন্ন ধরনের হয়। জ্ঞাপন কে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি হল—

১. পারস্পরিক জ্ঞাপন (Interpersonal Communication) :

দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে কথোপকথন চলে তাই হল পারস্পরিক জ্ঞাপন। প্রধানত কথাই হলো এই জ্ঞাপনের মাধ্যম। মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে বার্তা ভাব বিনিময় করে।এক বিশেষ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এর মধ্যে এই জ্ঞাপন প্রতিনিয়ত ঘটছে। পারস্পরিক জ্ঞাপন এর মধ্যে শুধুমাত্র কার্যকারী উপযোগিতা নেই , আনন্দ এবং দুঃখের মত অনুভবও আছে। এই জ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা। প্রত্যক্ষ জ্ঞাপন এর মধ্যে আন্তরিকতা আছে তা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

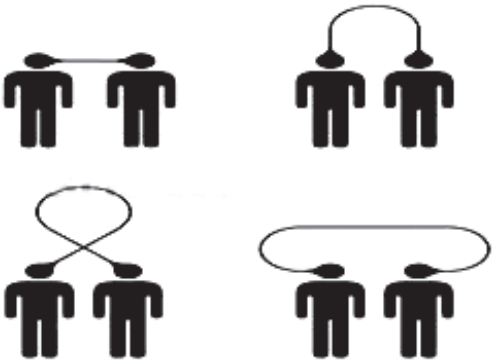

চিত্র সৌজন্যে- By Zern Liew

২. দলগত জ্ঞাপন (Group Communication) :

বেশকিছু মানুষ যখন জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তখন ঘটে দলগত জ্ঞাপন। একদল মানুষ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভাবের আদান প্রদান করে। এক্ষেত্রে কথোপকথন হলো প্রধান মাধ্যম। সভা-সমিতি আলোচনা সভা প্রভৃতি হলো দলগত জ্ঞাপন এর ক্ষেত্র। যেখানে একজন বলে বাকি সবাই শোনে। তারপর একে একে সকলের বলার সুযোগ আসতে পারে। তবে প্রতিবার্তা পেতে একটু সময় লাগে। দলগত জ্ঞাপন এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বেশ কিছু মানুষকে এর মাধ্যমে এক সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

গণ জ্ঞাপন (Mass Communication) :

জ্ঞাপন যখন গণ-র উদ্দেশ্যে করা হয় তখনই ঘটে গন জ্ঞাপন। যন্ত্র নির্ভর মাধ্যমের সাহায্যে এই জ্ঞাপন কার্য সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, ভিডিও এবং সিনেমা এই জ্ঞাপন কার্য সম্পন্ন করে। গন জ্ঞাপনে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাতে তাৎক্ষণিকতা ও স্বতস্ফূর্ততা একেবারেই থাকে না। প্রতিবার্তাও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। আজকাল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার্তা পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু যন্ত্র নির্ভরতার জন্য সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু চেষ্টা চলছে। গনজ্ঞাপন পুরোপুরি পরিকল্পিত জ্ঞাপন প্রক্রিয়া। গণ মাধ্যমের প্রভাব আধুনিক সমাজে সবচেয়ে বেশি।

গণ-রেখ জ্ঞাপন (Mass Line Communication)

রাষ্ট্রনেতারা সাধারণ মানুষের কাছে বক্তৃতার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যে যুক্তি যেমন থাকে তেমনি আবেগ থাকে। তারা জনগণকে শিক্ষিত করেন, প্রণোদিত করেন এবং উদ্দীপ্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ব্রিটিশদের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে। এই অসহযোগিতার বার্তা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছিল। এই হল গণ রেখ জ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত। চীনে মাও সে তুং, ব্রিটেনে চার্চিল বক্তৃতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন। এই জ্ঞাপনে প্রতিবার্তা পেতে সময় লাগে।

১.১.৪ সারাংশ

জ্ঞাপন মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপন করে। সামাজিক সম্পর্ক গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ স্থাপিত হলেই জ্ঞাপন ঘটে। জ্ঞাপন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এগুলি হল পারস্পরিক, অন্তর্মুখী, দলগত এবং গণ জ্ঞাপন।

১.১.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্ঞাপন কাকে বলে?

২. জ্ঞাপন এর উপাদান কি কি?

বড় প্রশ্ন

১. বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন ব্যাখ্যা করুন।

২. জ্ঞাপন এর সংজ্ঞা নির্দেশ করে বুঝিয়ে দিন পারস্পরিক জ্ঞাপন আর দলগত জ্ঞাপন এর মধ্যে পার্থক্য কি?

১.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলভিন এল দি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ২ ◘ মৌখিক এবং অমৌখিক জ্ঞাপন

গঠন

১.২.১ উদ্দেশ্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

১.২.৩ মৌখিক এবং অ-মৌখিক জ্ঞাপন

১.২.৪ সারাংশ

১.২.৫ অনুশীলনী

১.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.২.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা জ্ঞাপনের প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই ইউনিটে আমরা আরও দুটি ধরণের জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব। এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন।

- মৌখিক এবং অ-মৌখিক জ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা জ্ঞাপনের প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই ইউনিটে আমরা আরও দুটি ধরণের জ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব।আমরা সকলেই জ্ঞাপনের জন্য মৌখিক অর্থ বা অ-মৌখিক উপায় ব্যবহার করি। আমরা এই ইউনিটে এটি নিয়ে আলোচনা করব।

১.২.৩ মৌখিক এবং অমৌখিক জ্ঞাপন

মৌখিক জ্ঞাপন

মৌখিক জ্ঞাপন ঘটে মুখের ভাষায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা বলার মাধ্যমে। সেটা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর গল্প হতে পারে, আবার মা-ছেলের কথাবার্তা হতে পারে, আবার শিক্ষক ক্লাসে পড়ান, মুখের কথায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন জটিল বিষয়। এই সব হল মৌখিক জ্ঞাপন। মৌখিক জ্ঞাপনে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায়। প্রতি সেকেন্ডে প্রতিবার্তা বিনিময় ঘটে

চলেছে। শিক্ষক যখন ক্লাসে পড়ান ছাত্ররা তন্ময় হয়ে শোনে। এর অর্থ হল শিক্ষক যা মুখে বলছেন ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছে।

মৌখিক জ্ঞাপন স্থাপিত হয় মুখোমুখি বা ফোন, ভয়েস চ্যাট, ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্য কোনও মাধ্যমে। বক্তৃতা, সম্মেলন হিসাবে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মৌখিক জ্ঞাপনের ধরণ।

মৌখিক কথোপকথনের কার্যকারিতা বক্তৃতা, ভয়েস মড্যুলেশন, পিচ, ভলিউম, গতি এবং এমনকি শারীরিক ভাষা এবং ভিজ্যুয়াল সংকেতের উপর নির্ভর করে।

অ-মৌখিক জ্ঞাপন

অ-মৌখিক জ্ঞাপন মুখের ভাষায় ঘটে না, অভিব্যক্তিতে, গানে, ছবিতে লেখায় ঘটে চলে এই জ্ঞাপন। শেক্সপিয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ হল অ মৌখিক জ্ঞাপন যাত্রা। শুধু লেখায়, শব্দ নির্বাচনে, অসামান্য কুশলতা এবং ছন্দ বন্ধ নির্মাণে অমৌখিক জ্ঞাপন এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। কথা না বলেও কতকিছু যে জানানো যায় তা প্রকৃত অর্থে অকল্পনীয়। যেমন নাচ দেহের ভঙ্গিমাটি ছন্দে, নাটকীয়তায় অপরূপ শিল্পকলা মূর্ত হয়ে ওঠে এখানে। এটাই অ-মৌখিক জ্ঞাপন।

অ-মৌখিক জ্ঞাপন এর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি হলো ছবি। রেখায় রেখায় রঙের বিচিত্র খেলা তৈরি করে বিমুর্ত শিল্প যা দর্শকদের দেয় শিল্পের অনুভব, আনন্দ রসের অঙ্গীকার। লেখার অনেক আগে কিন্তু ছবির আগমন হয়েছে। মানুষ যখন কথা বলতে শেখেনি তখনো সে গুহাচিত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে। সভ্যতার উন্মেষ এর সঙ্গে মানুষ ছবি এঁকেছে। ভাস্কর্য নির্মাণ করেছে। তৈরি হয়েছে যুগান্তকারী ছবি, ভাস্কর্য ও শিল্পকলা। ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা পেয়েছি মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো, রুবেন্স ইত্যাদিকে। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইউরোপের রেনেসাঁর অগ্রদূত। ১৮ শতক থেকে ২০ শতক পর্যন্ত বহু নামিদামি শিল্পীই আবির্ভাব ঘটেছিল। রেমব্রাডন্ট, ভ্যান গগ, মাতিস, ক্লদ মোনে সালভাদর দালি, পিকাসো, রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত কবি, গদ্যকার, গীতিকার। প্রকাশের সর্বস্তরে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। এমন বহুমুখী প্রতিভা নিজের সৃষ্টিকে বোধ হয় সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারছিলেন না তাই ৬৩ বছর বয়সে শুরু করেছিলেন ছবি আঁকা। প্রায় ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত অক্লান্তভাবে ছবি এঁকেছিলেন প্রায় আড়াই হাজার ছবি। বিশেষজ্ঞরা বলেন তার ছবি ছিল অসামান্য। তার ছবি তার সব সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিনিয়তই আমরা এরকম অমৌখিক জ্ঞাপন এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি আকারে-ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গিমায় তার প্রকাশ ঘটে।

তবে, লক্ষ করা উচিত যে অ-মৌখিক যোগাযোগ একা বা সাংকেতিক ছবির মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে। নীচের চিত্রটি দেখুন একি একটি মুখের অভিব্যক্তি নির্দেশ করে যা আমরা 'স্মাইলি' বলে জানি। এগুলি হ'ল সুখ, রাগ, শোক, ভয় ইত্যাদি বিভিন্ন মুখের ভাব।ট্রাফিক পয়েন্টে একজন ট্রাফিক পুলিশকে দেখুন। তিনি কোনও কথা বলেন না তবে 'থামুন' বা 'যান' সিগন্যাল করতে তাঁর হাত ব্যবহার করেন। কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, "আপনি কি বাজারে যাচ্ছেন"? আপনি আপনার মাথাটি ব্যবহার করে "হ্যাঁ" বা "না" বলেন। উপরের সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কোনও শব্দ ব্যবহার না করে আমাদের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করি।

১.২.৪ সারাংশ

জ্ঞাপনকে আবার দুভাগে বিভাজন করা যায় একটি হলো মৌখিক জ্ঞাপন। যোগাযোগ যখন মুখের কথায় আটকে থাকে তখন হয় মৌখিক জ্ঞাপন। অন্যটি হলো অ মৌখিক জ্ঞাপন, সম্ভবত লিখিত যোগাযোগ হল অমৌখিক জ্ঞাপন, ছবির মাধ্যমে হলেও তা কিন্তু অ মৌখিক জ্ঞাপন এর পর্যায়ে পড়ে।

১.২.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মৌখিক জ্ঞাপন কাকে বলে?

২. অ মৌখিক জ্ঞাপন কি?

বড় প্রশ্ন

১. মৌখিক ও অ মৌখিক জ্ঞাপন এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

২. অ মৌখিক ও মৌখিক জ্ঞাপন এর মধ্যে কি কোনো বিরোধ আছে? যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

১.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice: Uma Narmla

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ): মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল বকানো (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক ৩ ◘ গণজ্ঞাপনের কাজ এবং উপাদান

গঠন

১.৩.১ উদ্দেশ্য

১.৩.২ গণজ্ঞাপনের কাজ

১.৩.৩ গণজ্ঞাপনের উপাদান

১.৩.৪ সারাংশ

১.৩.৫ অনুশীলনী

১.৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- গণজ্ঞাপনের কাজ
- গণজ্ঞাপনের উপাদান

১.৩.২ গণজ্ঞাপনের কাজ

গণজ্ঞাপন এর মূল কাজ তিনটি—তথ্য সরবরাহ করা, শিক্ষিত করা এবং বিনোদনের উপকরণ যোগানো। তথ্য সরবরাহের মধ্যে নিহিত আছে পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি (surveillance of the environment)। শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ করলেই হয় না, তথ্যকে ব্যাখ্যা করাও গণমাধ্যমের কাজ। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বলেন তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও আচরণের নির্দেশ এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়। আধুনিক গণমাধ্যম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হচ্ছে বিনোদনের ওপরে। রেডিও-টেলিভিশন, ভিডিও চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো বিনোদনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা। গণমাধ্যমের কার্যধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বিনোদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক গণজ্ঞাপনের কার্যধারা আরো বেশী জটিল হয়ে উঠেছে। কার্য বিন্যাসের রূপরেখা আরও বিস্তৃত হচ্ছে এবং সামাজিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী গণজ্ঞাপন এর কার্য ধারাতেও বৈচিত্র আসছে। বর্তমানে গণজ্ঞাপন এর কার্য গুলি কে এই ভাবে বর্ণনা করা যায় :

তথ্য (Information) :

এটা গণজ্ঞাপন এর প্রাথমিক কাজ। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত আমাদের বিপুল তথ্য সরবরাহ করছে। সংবাদের বিভিন্ন রচনায় ও প্রবন্ধে, রেডিও কথিকা, টেলিভিশন সংবাদ ও সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন তথ্য থাকে। তথ্য বিবিধ বিষয়ে আমাদের অবহিত করে এবং বিষয়ের সারমর্ম বুঝতে সাহায্য করে। বর্তমান পরিস্থিতি ও সামাজিক পরিমণ্ডল বুঝতে তথ্য ছাড়া গতি নেই। রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজ, সংস্কৃতি, খেলাধুলা প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে জানতে সর্বদাই তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

ব্যাখ্যা (Interpretation) :

গণমাধ্যম তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে। একটি বিষয়কে তথ্য দিয়ে জানা যায়। তবে সঠিক ব্যাখ্যা বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠার ফলে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের আর্থিক নীতিতে যদি কোন পরিবর্তন হয় তাহলে শুধুমাত্র তথ্য দিয়ে তা বোঝা যায় না। তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা থাকলে এই নীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পাঠকের সুবিধা হয়। শুধুমাত্র সংবাদপত্র নয়, রেডিও, টেলিভশনও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা সহ তথ্য সরবরাহ করার চেষ্টা করে। পরিবেশ সম্পর্কে, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে মানুষকে সঠিক ভাবে অবহিত করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

বিনোদন (Entertainment):

গণজ্ঞাপন এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো বিনোদন। বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যম বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বেশি প্রচার করে। রেডিওতে গান শুনে, নাটক শুনে মানুষের চিত্ত বিনোদন হয়। আর টেলিভিশনের প্রতি মানুষের যে দুর্নিবার আকর্ষণ তার মূলে আছে বিনোদন। সিরিয়াল, নাচ-গানের অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র দেখে মানুষ আনন্দ পায় উপভোগ করে। চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই হল মানুষকে বিনোদন উপহার দেওয়া। হলিউডের ছবি মূলত বিনোদনমূলক ছবি। বোম্বাইতে তৈরি হিন্দি ছবি বিনোদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

ঐতিহ্যের হস্তান্তর (Transmission of heritage) :

গণজ্ঞাপন এর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো সামাজিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র তাদের নিজ নিজ উপস্থাপনা দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। যে শিল্পভাবনা সমাজ-দর্শন এবং মূল্যবোধ প্রতিফলিত হচ্ছে গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুতে তা ঐতিহ্যের হস্তান্তর করতে সাহায্য করে।

ঐক্যমত স্থাপন (Consensus) :

তথ্য দিয়ে, গণমাধ্যম মানুষের মধ্যে ঐক্যমত স্থাপনে চেষ্টা করে। সংবাদপত্র, রেডিওতে, টেলিভিশনে বিভিন্ন মতামত, ব্যাখ্যাসহ আলোচনা পড়ে, শুনে এবং দেখে মানুষ নিজেদের মতামত তৈরী করে। যেমন পরিবেশ সচেতনতা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নারীদের অধিকার রক্ষা বিষয়ে ঐক্যমতে করতে পারে। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এই ঐক্যমতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কোন বিষয়ে ঐক্যমত স্থাপন জনমত গঠনের প্রাথমিক পর্যায় বলে অভিহিত হয়। বিভিন্ন মানুষের মতামতে ঐক্য না আসলে জনমত গঠিত হতে পারে না।

বিজ্ঞাপন (Advertisement):

আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অপরিহার্য অঙ্গ হল বিজ্ঞাপন। চাহিদা সৃষ্টি করতে, বাজার তৈরি করতে বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে। বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন বার্তাকে মানুষের কাছে দ্রুত সফলভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুনিশ্চিত ভাবে মাধ্যম নির্বাচন করছে। এর জন্য তারা খরচও করছে প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে গনমাধ্যমের অস্তিত্ব অনেকটাই নির্ভর করছে বিজ্ঞাপনের ওপরে। বিজ্ঞাপন থেকে যে আয় হয় সেটাই হল গণমাধ্যম এর প্রধান আয়। সুতরাং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার জন্যই সকল গণমাধ্যমে উৎসাহী। বলা যেতে পারে এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য গণমাধ্যম সর্বদাই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছে। কে বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার করবে সেটাই প্রধান বিবেচ্য। বিজ্ঞাপন মানেই বাণিজ্যিক সফলতা।

উন্নয়ন (Development) :

উন্নয়নের সঙ্গে গণমাধ্যমের যোগ রয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যমকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিকল্পনার মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই কাজে গণজ্ঞাপন সাহায্য করতে পারে। এশিয়া আফ্রিকার বহু দেশেই গণমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়েছে উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মানুষকে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণোদিত করছে সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশন। পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব মানুষকে বোঝাতে গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। উন্নয়নের কাজে গণমাধ্যম এর উপযোগিতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে জ্ঞাপনবিদ্যায় একটি নতুন শাখার উদ্ভব ঘটেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন জ্ঞাপন (development communication)।

১.৩.৩ গণজ্ঞাপনের উপাদান

১. গণজ্ঞাপন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যন্ত্র নির্ভরতা। এখানে জ্ঞাপন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। সংবাদপত্র হলো একটি গণমাধ্যম। এই মাধ্যম এর জন্য প্রয়োজন ছাপাখানা যেটি সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রনির্ভর। বেতার এবং টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র আরো অনেক বেশি যন্ত্রনির্ভর।

২. দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল বার্তার নৈর্ব্যক্তিকতা। গণজ্ঞাপনে যাদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হচ্ছে তাদের পরিচয় জানা থাকে না, তাই বার্তার চরিত্র হয় নৈর্ব্যক্তিক। Gary Gumpert এবং Robert Catchcart বলেছেন গণজ্ঞাপন এর বার্তার লক্ষ্য হল "to whom it may concern" যাদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হচ্ছে তারা এটা গ্রহণ করবেন এটা ভেবে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কারা শুনছেন, দেখছেন তা জানা যায় না। যাদের আগ্রহ আছে তারাই দেখবেন।

৩. প্রতিবার্তা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না। চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রতিবার্তা পেতে সময় লাগে। বর্তমানে রেডিও এবং টিভিতে সরাসরি প্রতিবার্তা পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু লাইন না পাবার জন্য সামান্য দেরি হচ্ছে।

৪. গণমাধ্যমের শ্রোতারা অসংগঠিত। একই বার্তা বিপুল শ্রোতা মন্ডলী পড়ছে বা দেখছে কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। একে অন্যকে চেনে না। যেমন একই সংবাদ টেলিভিশনে বহু মানুষ দেখছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনরকম যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে না। এই অভিনব দিকটির কথা উল্লেখ করেছেন Herbert Blumer, তিনি বলেছেন গণমাধ্যমের শ্রোতৃ মন্ডলী কেউ পরস্পরকে চেনেনা, কিন্তু পছন্দের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল আছে। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া শ্রোতৃ মন্ডলী কে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রভাবিত করতে চায়। এই প্রভাবের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো বাণিজ্যিক সফলতা। সকল গণমাধ্যম চায় এমন বিষয় পরিবেশন করতে যাতে শ্রোতৃ মন্ডলীর মন দ্রুত জয় করতে পারে। রুপা মারডক, টেড টার্নার, ক্যারি পাকারের মত মিডিয়া মালিকদের হাতে একাধিক সংবাদপত্র, সাময়িক পর্ব বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেল ও মিডিয়া কেন্দ্রীভূত মালিকানা মালিকানাকে আরো শক্তিশালী করেছিল। মালিকানার এ কেন্দ্র প্রবণতা গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে অনেক সময় রাষ্ট্রের মদত থাকে।

১.৩.৪ সারাংশ

জ্ঞাপন গড়ে ওঠে কয়েকটি উপাদানকে আশ্রয় করে। যেমন প্রেরক, গ্রাহক, মাধ্যম ও বার্তা। গণজ্ঞাপন-এর বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণজ্ঞাপন-এর বেশ কিছু উপাদান আছে। গণজ্ঞাপন-এর আছে নির্দিষ্ট কিছু কাজ। এই কাজগুলি দিয়ে বোঝা যায় গণজ্ঞাপনের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রভাব।

১.৩.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গণজ্ঞাপন এর উপাদান গুলি সংক্ষেপে লিখুন।

২. পারস্পারিক জ্ঞাপন এবং গণজ্ঞাপন এর পার্থক্য লিখুন?

বড় প্রশ্ন

১. গণজ্ঞাপন এর সংজ্ঞা দিন। গণজ্ঞাপণ গণমাধ্যমের ভূমিকা কি?

২. গণমাধ্যম এর কাজগুলি আলোচনা করুন।

১.৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Theories of Mass Communication : M. L. DeFleur S. J. Ball Rokeach

২) Mass Communication in India : Keval J. Kumar

৩) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

৪) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৫) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ডক্টর বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৬) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ডক্টর বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৪ ◘ গণজ্ঞাপনের প্রভাব-গণজ্ঞাপন এর বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

গঠন

১.৪.১ উদ্দেশ্য

১.৪.২ গণজ্ঞাপনের প্রভাব

১.৪.৩ গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

১.৪.৪ সারাংশ

১.৪.৫ অনুশীলনী

১.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- গণজ্ঞাপনের প্রভাব
- গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

১.৪.২ গণজ্ঞাপনের প্রভাব

ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে হিটলারের বক্তৃতা শুনে জার্মানরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর বেতার বার্তা ভারতীয়দের নতুন আশায় উদ্দীপ্ত করেছিল। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। গণমাধ্যম যে মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। গণমাধ্যম এর ক্ষমতার উৎস লুকিয়ে আছে এই প্রভাব তৈরীর ক্ষমতার মধ্যে। প্রভাব নির্ধারিত হয় কোন মাধ্যমের ক্ষমতা বেশি তার ওপর।

১৯৪০ সালে গণমাধ্যমের প্রভাবের বিষয়টি গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের চোখে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে কাজ শুরু হয়। পল লাজারফেল্ড (Paul Lazarsfeld) এবং বার্নার্ড বেরেলশন (Bernard Berelson) মানুষের উপরে গণমাধ্যমের প্রভাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন মানুষের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে

গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই সামান্য। তারা দেখেন মানুষের রাজনৈতিক আচরণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই সামান্য কারণ আগে থেকেই মানুষের মনের মধ্যে যে ধারণা রয়েছে গণমাধ্যম তাকেই পরিস্ফুট করছে, বদল করতে পারছে না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক ধারণা যা ছিল তাই থাকছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক ধারনার প্রতি বিরূপ থাকে গণমাধ্যমটি ওই বিরূপতা কে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিষয়টিকে তারা minimal effects বলে অভিহিত করেছিলেন। তারা বলেছিলেন গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞাপন হচ্ছে সেখানে আছে দুটি স্তর। গণমাধ্যম থেকে বার্তা যাচ্ছে প্রথমে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে. তারপর সেখান থেকে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। ওপিনিয়ন লিডাররা গণমাধ্যম থেকে পাওয়া বার্তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন।

প্রভাব

বিনোদন

টেলিভিশন হলো বিনোদন মাধ্যম। টেলিভিশন দেখে মানুষ আনন্দ পায় এবং অবহিত হয়। বিভিন্ন কথায়, ছবিতে, সংগীতে বর্ণময় অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ এই বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি :

গণমাধ্যম সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। টেলিভিশন আসার ফলে গণমাধ্যমের প্রভাব আরও বেড়েছে। ১৯৭০ সালে একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ টেলিভিশনকে ''The new parent'' বলে অভিহিত করেছিলেন। শিশুকে মানুষ করতে বাবা-মার যে ভূমিকা, টেলিভিশন তা নিয়ে নিয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। বাবা-মা, আগের প্রজন্মের মানুষ জন, শিক্ষকের কাছ থেকে মানুষ মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। এক কথায় আজ মানুষের মূল্যবোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে গণমাধ্যম।

চিত্র সৌজন্যে -Media Entertainment Png & Free Media Entertainment.png Transparent ... pngio.com

শিক্ষা

গণমাধ্যম এর মধ্যে দিয়ে মানুষ শিক্ষার পাঠ নেয় । যেকোনো শিক্ষার জন্যই তথ্য পাওয়া, যুক্তি-তর্ক বোঝাটা জরুরি। গণমাধ্যমের পরিবেশিত তথ্য দিয়ে মানুষ জানছে। আলোচনার মাধ্যমে আরও বেশি শিক্ষিত হয়ে উঠছে।

টেলিভিশনের সামাজিক প্রভাব

গণমাধ্যম যতবেশি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে তার প্রভাব তত বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষকে নিয়েই সমাজ। গণমাধ্যম পরিবারের সবচেয়ে আধুনিক ও প্রভাবশালী মাধ্যম হলো টেলিভিশন। সাধারণ মানুষের কাছে এর বিপুল জনপ্রিয়তা। তারা সংবাদপত্র পড়ে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে জানা ও বোঝার জন্য। কিন্তু টেলিভিশন দেখে আনন্দ পাবার জন্য। সিনেমা সিরিয়াল এবং নাচ-গানের অনুষ্ঠান দেখে উপভোগ করে। টেলিভিশন এর আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে খুবই গ্রহণীয়।

দেখতে দেখতে আমরা আনন্দে মশগুল হয়ে যাই এবং দুঃখ ও হতাশায় কষ্ট পাই আবার উজ্জীবিত হই। এখানেই টেলিভিশন অনেক এগিয়ে আছে। টেলিভিশনের প্রভাব কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছেন "medium is the message"। টেলিভিশন মাধ্যমের এটাই মূল বিশিষ্টতা।

টেলিভিশনের মাধ্যমে মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে কনজিউমারইজম এর মধ্যে। Ben Bagdikian বলেছেন টেলিভিশন সবচেয়ে ন্যুনতম খরচে সবচেয়ে বেশি পণ্য বিক্রি করতে চায়। (T.V is designed primarily to sell the maximum amount of merchandise at minimum cost)। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন টিভি আমাদের বেচে দিচ্ছে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে।

১.৪.৩ গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য

গণ জ্ঞাপনের মধ্যে যে মাধ্যমগুলি রয়েছে সেগুলি হল সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র এবং সাম্প্রতিকালের নিউ মিডিয়া, এদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই মাধ্যমগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে।

সংবাদপত্র : Everyman's Encyclopedia সংবাদপত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছে "Newspapers are the published sheets containing news and features of general interest, usually printed and distributed regularly." সংবাদপত্রে সংবাদ থাকবে, ফিচার থাকবে এবং মুদ্রিত সংবাদপত্রটি নিয়মিত মানুষের মধ্যে বন্টিত হবে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Edwin Emery বলেছেন যে সংবাদপত্রকে শুধুমাত্র মুদ্রিত ও নিয়মিত প্রকাশিত হলেই চলবে না অর্থের বিনিময়ে তাকে ক্রয়যোগ্য হতে হবে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে মানুষ তা কিনতে পারবে। আনন্দবাজার, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, বর্তমান হল সংবাদপত্র যা মুদ্রিত, বন্টিত হয় অর্থের বিনিময়ে। গণমাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র হল সবচেয়ে পুরনো মাধ্যম। ১৬২২ সালে লন্ডনে Nathaniel Butter প্রথম Weekly News প্রকাশ করেন। ১৬৯০ সালে আমেরিকাতে প্রকাশিত হয় Boston Public Occurence, both Foreign and Domestic. ভারতে প্রথম সংবাদপত্র বেরোয় কলকাতা থেকে ১৭৮০ সালে। James Augustas Hickey-র Bengal Gazette, ১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বার করেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। পত্রিকার নাম ছিল সমাচার দর্পণ, ভারতীয়দের উদ্যোগে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন রাজা রামমোহন রায়, ১৮২২ সালে প্রকাশ করেন ফারসী কাগজ মীরাৎ-উল-আকবর, এর আগের বছর ১৮২১-শে প্রকাশ করেন সংবাদ কৌমুদী।

আধুনিক সংবাদপত্র দু ধরনের হয়—ব্রডশীট এবং ট্যাবলয়েড। সকালবেলায় যে কাগজগুলি পাই, যেমন আনন্দবাজার, প্রতিদিন, বর্তমান, টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, এগুলি ব্রডশীট পত্রিকা। দৈর্ঘে ৫২ থেকে ৫৩ সেন্টিমিটার, প্রস্থে আট কলাম। ট্যাবলয়েড হল ব্রডশীটের অর্ধেক মাপের কাগজ। ব্রড শীটকে ভাজ করলে ট্যাবলয়েডের মাপ পাওয়া যাবে। বিদেশে ট্যাবলয়েড খুব জনপ্রিয় কাগজ, লন্ডনের সান, ডেইলি মিরর, আমেরিকার ইউস এস এ টুডে হল ট্যাবলয়েড কাগজ। এদের প্রচার সংখ্যা অনেক বেশি।

আজও সংবাদপত্রকে মনে করা হয় গণমাধ্যম পরিবারের বিগ ব্রাদার, সাধারণ মানুষের ওপরে তার প্রভাব বিপুল। বেতার : সংবাদপত্রের পর যে মাধ্যমটি সাধারণ মানুষের কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়েছে তা হল বেতার। মুহূর্তের মধ্যে যে কোন বার্তাকে কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, গণজ্ঞাপনে এমন গতি আগে কেউ কল্পনাও করেনি। বেতার আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মনে করেছিলেন সংবাদপত্রের দিন শেষ। বাস্তবে অবশ্য তা হয়নি। সংবাদপত্রের বিকাশ অব্যাহতই থেকেছে। বাস্তবে যেটা ঘটেছে তা হল সংবাদপত্রের পাশাপাশি বেতারের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেতার : বেতার কথা-গানের তাজমহল। এ যেন কথায় কথায় রাত হয়ে যাওয়া দিনের কাহিনী। সংবাদ, সমীক্ষা, গানবাজনা, নাটক দিনরাত হয়ে চলেছে। বেতার তরঙ্গে দিবারাত্র শব্দাশ্রয়ী বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বেতার সেটে সাধারণ মানুষ মন দিয়ে অন্তরঙ্গভাবে সে সব শুনছে। সংবাদ পাঠ শুনে তার জানার পরিধি বাড়ছে, গান, নাটক শুনে তার চিত্তে ঢেউ তুলে যায় আনন্দ। বেতার লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যম। যা এখুনি ঘটছে তা আমরা শুনতে পারি। আগে বেতারে শুধুমাত্র লাইভ অনুষ্ঠানই হত। গান বাজনা এমনকি মহালয়ার দিনে মহিষাসুরমর্দিনী। এখন সংবাদ, সমীক্ষা ছাড়া সবই রেকর্ডেড অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বেতার আমাদের জানায়, শিক্ষিত করে এবং আনন্দ দান করে (inform, educate and enturtain)। বেতার হল মানুষের অন্তরঙ্গ মাধ্যম।

বেতার হল instant medium, এই মুহূর্তে যা ঘটেছে তা সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে জানায়। ক্রিকেট খেলার ধারা বিবরণীর জন্য শ্রোতা উন্মুখ হয়ে থাকে।

বেতার সেট খুব অল্প দামে কেনা যায়। ট্রানজিসটর সেট আসার পর খুব নাম মাত্র দামে বেতার সেট কেনা যেত। এটা একটা বিপ্লব বলা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা খুব সামান্য এ্যানার্জিতে সেট চলে। মাত্র দুটো, তিনটে ব্যাটারির সাহায্যে প্রায় একমাস চলে যায়। গ্রামের একজন কৃষকও সহজে একটি সেট কিনে ব্যবহার করতে পারে।

সংবাদপত্র একজনই পড়তে পারে, কিন্তু বেতার সেট বেশ কয়েকজন মিলে শুনতে পারে। আট দশ জন মানুষ একটি সেট থেকে বেতার অনুষ্ঠান উপভোগ করে শিক্ষিত হয়, আনন্দ পায়।

বেতার সেট সহজে বহনযোগ্য। ছোট ট্রানজিসটর রেডিও হাতে নিয়ে সেখানে খুশী যাওয়া যায়। এখানে তার মিল সংবাদপত্রের সঙ্গে। মানুষ খুব সহজে বেতার সেট হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে।

খুব অল্প খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় বেতারে। জিঙ্গলস ব্যবহার করে শ্রোতাদের মনে জয় করা যায়। বেতারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বেতার মাধ্যম নিরক্ষরতার বাধা অতিক্রম করে একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ভারতের মতো দেশে যেখানে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বিপুল, বিদ্যুৎহীন গ্রামাঞ্চলের সীমানা অনেক বিস্তৃত এবং দারিদ্র বেশি যেখানে উন্নয়নের বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে বেতারের গুরুত্ব অনেক বেশি। একটা ছোট ট্রানজিসটর সেট থেকে বেশ কিছু মানুষ বেতার অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। গ্রামীণ ভারতে বেতারের প্রভাব বেশি।

টেলিভিশন : গণমাধ্যম পরিবারে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল টেলিভিশন। সংবাদপত্র মানুষের বৌদ্ধিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, বেতার দূরকে নিকট করলো। আর টেলিভিশন হৃদয়ে মননে আলোড়ন তুলে মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাটাই পাল্টে দিল। চিন্তায়, অভিজ্ঞতায় যোগ করলো নতুন মাত্রা। সাধারণ মানুষের জীবন দর্শনটাই বদলে গেল। কোন গণমাধ্যমই এর আগে সমাজ জীবনকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করেনি।

টেলিভিশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটি দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম। প্রবাদে আছে একটি ছবি দশ হাজার শব্দের সমান। টেলিভিশনের পর্দায় যে ছবি আসে তা চলমান। চলমান ছবি আরও বেশি বাঙ্ময়, জীবন যে রকম তাই পাওয়া যায় হাঁটার, চলায়, বলায়, দ্রভঙ্গীতে। শব্দ চলমান ছবিকে আরও অর্থপূর্ণ করে তোলে। টিভির জাদুতে আটকে পড়ে মানুষ। দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে যায় বর্ণময় চলমান ছবিতে। টেলিভিশন মাধ্যম হিসেবে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে মাধ্যমই হয়ে ওঠে বার্তা, মাধ্যমের জাদুতে আটকে পড়ে মানুষ। মার্শাল ম্যাকলুহান এজন্যই বলেছেন 'medium is the message, মানুষের আবেগের কাছে তার আবেদন সবচেয়ে বেশি, এটাই তার বৈশিষ্ট্যের অনন্যতা।

টেলিভিশন সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম। যে কোন ঘটনাকে মানুষ সরাসরি দেখতে পায়। দেখে শুনে যে অভিজ্ঞতা পায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা যে বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। একই সঙ্গে টেলিভিশন বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ, সিরিয়ালের, রিয়েলিটি শো-র কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে টেলিভিশনের জাদুতে মুগ্ধ হয় মানুষ। দৃশ্যের ম্যাজিক তার হৃদয়ে আবেগের অনুরণন তুলে যায়। একেবারে বেড রুমে হাজির হয়েছে টেলিভিশন। বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের বার্তা নিয়ে বেডরুমে হাজির। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে আসে কর্মাশিয়াল ব্রেক, শুধু বিজ্ঞাপনের জন্য। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের পরিসর অনেক বড়, বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন। পুরো মাধ্যমটাই দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞাপনের ওপরে, সেই সিরিয়ালই বেশি দিন চলবে যার দর্শক টানার ক্ষমতা বেশি, বেশি দর্শক মানেই অনেক ক্রেতা, তাই বিজ্ঞাপন পাবার সম্ভাবনাও বেশি।

বেতারের মতো টেলিভিশনও অন্তরঙ্গ মাধ্যম। অনুষ্ঠান দেখার সময়, বিশেষ করে সিরিয়াল ও রিয়ালিটি শো-র ক্ষেত্রে দর্শক পর্দায় যা দেখানো হচ্ছে তার অংশীদার হয়ে ওঠে। যে বা যারা দেখছে সবাই হন টেলিভিশনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

টেলিভিশনের সামাজিক প্রভাব বিপুল। ভোগ্যপণ্যের জন্য মানুষের যে চাহিদা দ্রুত বাড়ছে, তার অন্যতম কারণ টেলিভিশন কনটেন্ট। বর্ণময় অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপন মানুষের মনস্তত্বে গভীর প্রভাব ফেলছে। ভীষণ কল্পনাপ্রবণ ও আত্মসুখী হয়ে উঠেছে মানুষ। টেলিভিশনে যে উজ্জ্বল গ্ল্যামারের ছবি ফুটে ওঠে তাই আলোড়ন তুলে যায় সাধারণ মানুষের মনে।

বাচ্চাদের মনেও প্রভাব ফেলে টেলিভিশন। কমিক্স, ভায়োলেন্স তাদের সুকুমার মনকে চঞ্চল করে তোলে। একাগ্রতা কমে যায়। ফলে মন সংযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

চলচ্চিত্র : গণমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল চলচ্চিত্র বা সিনেমা। যে কোন বিষয়কে এই মাধ্যমের সাহায্যে বিশেষ আবেদনসহ প্রকাশ করা যায়। শিল্পবোধ যুক্ত হয় প্রকাশভঙ্গীতে। চলচ্চিত্রের আবেদন দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। ভাষার প্রাচীর ধুয়ে মুছে যায় ছবির ভাষার কাছে। চলচ্চিত্রই প্রথম বিশ্বায়নের প্রয়াস নিয়েছিল। হলিউডের ছবি বিশ্বের সমস্ত মানুষকে মোহিত করেছিল।

প্রথমে ছবিতে কথা ছিল না। নির্বাক চলচ্চিত্র শিল্পভাবনা প্রকাশে ছিল খুবই সফল। আইজেনসটাইন ও চ্যাপলিন নির্বাক ছবিকে শিল্পরূপ নির্মাণে কাজে লাগিয়েছিলেন। সম্পাদনা ও শব্দযোজনাকে কাজে লাগিয়ে দর্শকদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন এক অপরূপ শিল্প নির্মাণ।

চলচ্চিত্রকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) কাহিনী চিত্র (Feature film), (২) তথ্যচিত্র (Documentary film)।

কাহিনী চিত্রের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথমত ছবিতে একটি গল্প থাকবে এবং ঐ গল্পকে কেন্দ্র করে পরিচালক তার ভাবনা ধীরে ধীরে মেলে ধরবেন। দ্বিতীয়ত ছবি তোলার কাজে ক্যামেরা, লাইটের প্রয়োজন। দরকার সাউন্ডের প্রয়োগ। তারপর ছবির সম্পাদনা একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, যেখানে তৈরি হয় একটা গোটা ছবি।

দ্বিতীয়ত, ছবির একটি ব্যবসায়িক দিক রয়েছে। কাহিনী চিত্র তৈরি করতে প্রচুর অর্থ লাগে। ঐ টাকা উশুল না হলে ছবি ফ্লপ করবে। কাহিনী চিত্র নির্মাণের ব্যাপারটা একটা শিল্পের মতো, ব্যবসায়িক সম্ভাবনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, কাহিনীচিত্রের মধ্যে রয়েছে অভিনয়, মেক্-আপ, চিত্রনাট্য, সংগীত, ক্যামেরা, শিল্প নির্দেশনা ও সম্পাদনার মতন বিষয়। প্রতিটি বিষয় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বহু শিল্পের সার্থক সমন্বয়ে তৈরি হয় বাইসেকল বিভস্, পথের পাঁচালী, সাউন্ড অফ মিউজিক, রশোমনের মতো উল্লেখযোগ্য কাহিনী চিত্র। দেড় থেকে দু ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় কাহিনী চিত্র।

তথ্যচিত্র তথ্য প্রধান হয়। পরিচালক একটি বিষয়কে পরিবেশন করেন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। সেখানে গল্প খুব সামান্য। কিন্তু ইতিহাস অনেক। পরিচালক হাঁটেন একেবারে গবেষকের মতো। তাঁর লক্ষ্য অনুসন্ধান চালিয়ে সত্যকে তুলে ধরা। তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী, শিল্পবোধ বিষয়টিকে নতুন তাৎপর্য দেবে। ফ্লাহার্তির নানক অফ দা নর্থ, সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রনাথ হল সত্যানুসন্ধানী তথ্য চিত্র।

তথ্য চিত্রে স্থির চিত্র ও চলমান চিত্র দুইই থাকতে পারে। তথ্য চিত্রের অনিবার্য অনুষঙ্গ হল ধারাবিবরণী। ভাষ্যকার পরিবেশিত চিত্রগুলিকে অর্থবহ করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ, ইনার আই তথ্যচিত্রে সত্যজিৎ রায় নিজেই ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মন্তাজ। মন্তাজের অর্থ হল একত্রীকরণ। এটা হল আক্ষরিক অর্থ। প্রকৃত অর্থে মন্তাজ ছবির গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে দৃশ্যভাবনাকে সার্থকভাবে মেলে ধরে। সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্রের চিত্রভাষা। পরিচালক তাঁর সৃজনশীল ভাবনাকে চিত্র ভাষার মাধ্যমেই গড়ে গেলেন। চারুলতায় চারুর একাকিত্ব, অপরাজিতয় অপুর এগিয়ে চলা, মেঘে ঢাকা তারায় সীতার বেঁচে থাকার আর্তি চিত্র ভাষার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে মননে অনুরণন তুলে যায়।

নিউমিডিয়া : ডিজিটাল মিডিয়াই হল নিউমিডিয়া বা নতুন মাধ্যম। এখনও পর্যন্ত এই মাধ্যমটিই হল নতুন, তাই একে বলা হচ্ছে নতুন মাধ্যম। এর ভিত্তি হল কম্পিউটার প্রযুক্তি।

প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সংখ্যা নির্ভর। শূন্য আর এক তৈরি করে বাইনারি ব্যবস্থা বা যে কোন তথ্যকে ধরে রাখতে পারে, প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। আবার ছড়িয়েও দিতে পারে।

নিউমিডিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন দিক। সৃজন, উপভোগ, বন্টন, রূপান্তর এবং সরক্ষণ করার সুযোগ রয়েছে। ব্লগ লিখে, টুইট করে, হোয়াটসআপে, ফেসবুকে নিজের ভাবনাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ইউটিউব, বিভিন্ন ওয়েবসাইট, সোসাল মিডিয়া হল নিউ মিডিয়ার অথবা ডিজিটাল মিডিয়ার উদাহরণ।

নিউ মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কপি রাইটের প্রভাব খর্ব হওয়া। যদিও ইনটেলেকচুয়াল প্রপর্টি রাইটস্-এর প্রভাব কিছুটা থাকলেও নিউ মিডিয়ার দরজা অনেক প্রশস্ত। প্রকৃতপক্ষে নিউ মিডিয়া ওপেন কনটেন্ট মুভমেন্টের সূচনা করেছে। গুগল, ইয়াহুর মাধ্যমে আমরা প্রচুর ওয়েব সাইটের সন্ধান পাই।

সমস্ত গণমাধ্যমকেই ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে সমঝোতা করতে হচ্ছে। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনের ওয়েবসাইট আছে। সাধারণ মানুষ ইচ্ছেমতো নেট পরিষেবার মাধ্যমে এইসব ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারেন।

নিউমিডিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কনভারজেন্স। একই ফর্মাটে অনেকগুলো ফর্মাট এসে মিশছে। লিখিত টেক্সট্, অডিও, ভিডিও, গ্রাফিক্স ইচ্ছেমতো নিয়ে আসা যায় কমপিউটারের পর্দায়, ল্যাপটপে, এমনকি মুঠোফোন অর্থাৎ মোবাইলে। এর নাম কনভারজেশনস। অনেক ঝর্ণা এসে মিশছে এক জলাশয়ে। কনভারজেন্সের তুলনা নেই।

নিউ মিডিয়ার অঙ্গ সোশ্যাল সাইট নেটওয়ার্কিং গণমাধ্যমের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল যুগ মানুষের অভ্যাসটাই বদলে দিচ্ছে। বই, সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র পাঠের সময় কমছে। কারণ ফেসবুক, হোয়াট্সঅ্যাপ, টুইটার করতে গিয়ে অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে। নিউ মিডিয়ার হাতেই রয়েছে আগামী দিনের গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎ।

১.৪.৪ সারাংশ

গণজ্ঞাপন এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার সামাজিক প্রভাব। মানুষের চিন্তা ও আচরণে সেই প্রভাব পরিস্ফুট হয়, যা দিয়ে গণজ্ঞাপন এর সামাজিক প্রভাব বাড়ে। বিভিন্ন গণমাধ্যম এর মধ্যে দিয়ে গণজ্ঞাপন কার্যকারী হয়ে থাকে। যেমন সংবাদপত্র, বেতার টেলিভিশন চলচ্চিত্র এবং সাম্প্রতিক কালের নিউ মিডিয়া। গণমাধ্যম এর পরিচয় জানতে গেলে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। এক একটি মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য এক এক রকম হয়।

১.৪.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গণজ্ঞাপন এর কি কি মাধ্যম থাকে আলোচনা করুন।

২. এর মধ্যে কোনটি অমৌখিক জ্ঞাপন এর মধ্যে পড়ে?

বড় প্রশ্ন

১. গণজ্ঞাপন এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

২. গণজ্ঞাপন এর বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করুন।

৩. গণমাধ্যমের বিভিন্ন মাধ্যমগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. ডিজিটাল মাধ্যম কি গণমাধ্যমের চরিত্র পাল্টে দিচ্ছে? ব্যাখ্যা করুন।

১.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice- Uma Narmla

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ): মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক ১ ◘ জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব, দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব, জ্ঞাপন পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব

গঠন

২.১.১ উদ্দেশ্য

২.১.২ প্রস্তাবনা

২.১.৩ জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব

২.১.৪ দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব

২.১.৫ জ্ঞাপন এ পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব

২.১.৬ সারাংশ

২.১.৭ অনুশীলনী

২.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.১.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব
- দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব
- জ্ঞাপন পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব

২.১.২ প্রস্তাবনা

জ্ঞাপন তত্ত্বের বিচিত্র রূপ তুলে ধরা হবে এখানে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে আলোচনা করছেন জ্ঞাপনের কার্যধারা এবং তার প্রভাব সম্পর্কে। তাত্ত্বিক আলোচনা আমাদের সাহায্য করবে জ্ঞাপন এর প্রকৃত পরিচয় জানতে এবং বুঝতে।

২.১.৩ জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব

যেকোনো বিষয় জানতে গেলে তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্ব আমাদের সাহায্য করে জ্ঞাপন এর চরিত্রকে বুঝতে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাপনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। Bernard Berelson এবং Leonard Berkowitz বলেছেন জ্ঞাপন হলো প্রতীকের সাহায্যে তথ্য, আবেগ, ভাবনা ও দক্ষতার প্রেরণ। (Communication is transmission of information– ideas– emotions and skills etc. by symbols)। Den. F. Faules এবং Denis. C Alexander জ্ঞাপন কে প্রতিকী আচরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মূল বক্তব্য হলো জ্ঞাপন ক্রিয়া সর্বদাই প্রতীকের সাহায্য সংগঠিত হয়। প্রেরক ও গ্রাহক দু'জনকেই দুজনের অর্থ বুঝতে হবে, এটা সম্ভব হলেই বুঝতে হবে জ্ঞাপন সফল হচ্ছে।

John C Merril এবং Ralph L Lowenstein বলেছেন জ্ঞাপন হলো দ্বিমুখী রাস্তা। প্রেরক পাঠাচ্ছে এবং গ্রাহক তা গ্রহণ করছে। বার্তা দুই রাস্তা ধরেই চলাফেরা করছে।

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Colin Cherry বলেছেন জ্ঞাপন হলো উদ্দীপনা প্রেরণ ও প্রতুত্তর তৈরীর প্রক্রিয়া। (transmission of stimuli and the evocation of response)। শুধুমাত্র বার্তা বিনিময় দিয়ে জ্ঞাপন হয় না। বার্তা গ্রাহকের কাছে যাচ্ছে তা অবশ্যই উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। উদ্দীপিত হলেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, তৈরি হবে প্রতুত্তর। আসলে Colin Cherry যেটা বলতে চেয়েছেন তা হলো "উদ্দীপনা ও প্রত্যুত্তর" এর মধ্যে যে মানবিক উপাদান রয়েছে সেটাই জ্ঞাপনকে সার্থক করে তোলে।

জ্ঞাপন এর চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে George Gerbner বলেছেন জ্ঞাপন হলো বার্তার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন। (Communication is social interaction through messages)। বার্তা বিনিময় হয় প্রতীকের মাধ্যমে। এই প্রতীক সর্বদাই অর্থবহ। প্রেরক যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন গ্রহীতা সেই প্রতীকের অর্থ বুঝে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন। এভাবেই বার্তার আদান-প্রদান ঘটছে এবং তা অর্থবহ হয়ে উঠছে। সমাজে সর্বদাই এরকম অসংখ্য আদান-প্রদান ঘটছে এবং তার মধ্যে দিয়ে ঘটছে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। মানুষ, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, সরকার বার্তার আদান-প্রদান এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণ করছে।

বিংশ শতকের বিখ্যাত গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ হলেন Wilbur Schramm, উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। জ্ঞাপন-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন আমরা যখন কাউকে কিছু জ্ঞাপন করি তখন তার সঙ্গে তথ্য, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিতে চেষ্টা করি। দুজনের মধ্যে তৈরি হয় একটা সম্পর্ক যাকে Schramm বলেছেন Commonness, বাংলায় একে বলা যেতে পারে সাধারণ গ্রাহ্যতা। Schramm বলেন "When we communicate, we are trying to establish a commonness with someone, That is we are trying to share information, an idea or attitude". জ্ঞাপন এর ধারণার মূল সুরটি এখানে পাওয়া যায়। যে-কোনো বিষয়কে সমানভাবে ভাগ করতে পারলে জ্ঞাপন সার্থক হয়ে ওঠে।

দেখা যাচ্ছে জ্ঞাপনে বার্তা বিনিময় একটি অনিবার্য ঘটনা। বার্তা বিনিময় তখনই সফল হবে যখন বার্তার অর্থ উদ্ধার করা যাবে। কার কাছে কোন বার্তা কিভাবে পৌছবে তার ওপর জ্ঞাপন এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রাথমিকভাবে বার্তার অর্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো সাধারণ অর্থসূচক (denotative)

এবং অপরটি হলো গুণবাচক (Connotative)। অনেক সময়ই দেখা যায় একটি শব্দ দুটি অর্থ প্রকাশ করে। একটি অর্থ সাধারণভাবে সবাই যেটা বোঝে। অন্যটি একেক জন একেক রকম ভাবে বোঝে। প্রথমটি সাধারণ অর্থসূচক, দ্বিতীয়টি গুণবাচক। যেমন ধনী শব্দটি শোনা মাত্র সকলে বোঝে সম্পদশালী। যার সম্পত্তি আছে টাকা আছে। কিন্তু গুণবাচক অর্থে একেক জন একেক রকম বুঝবেন। যেমন একজন ভিখারির কাছে নিম্নআয়ের মানুষও ধনী, মধ্যবিত্তের কাছে কোটিপতি হলো ধনী। আবার কোটিপতির কাছে হাজার কোটির শিল্পপতি ধনী বলে বিবেচিত হতে পারে। একটি শব্দের অর্থ ভিন্ন হতে পারে পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী, আবার সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলর অনুযায়ী শব্দের অর্থ ভিন্ন হয়।

জ্ঞাপন বুঝতে গেলে তাত্ত্বিক রূপরেখা জানা অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাপন চরিত্রকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এইসব তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ এর মধ্য দিয়ে আমরা জ্ঞাপনকে বোঝার চেষ্টা করি। প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। বুঝতে পারলে জ্ঞাপন ধারণাকে বোঝা অনেক সহজ হয়।

২.১.৪ দ্বি-স্তর ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব (Two step flow theory and the multistep flow theory)

দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র একেবারে পাল্টে শুরু হয় দ্বিমেরু রাজনীতি অথবা বাইপোলার পলিটিক্স। আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী দেশগুলির জোট বাঁধে। রাশিয়া নেতৃত্বেই পূর্ব ইউরোপের দেশ গুলি নিয়ে তৈরি হয় সমাজতান্ত্রিক শিবির। শুরু হয় ঠান্ডা যুদ্ধ। যার ভিত্তি হলো মতাদর্শের লড়াই। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধ গোটা দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই জটিল অবস্থায় গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা জনগণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ও গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। মানুষের জনমত বোঝার জন্য Paul Lazarsfeld– Bernerd Berelson এবং Hazel Gaudet গবেষণা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই তৈরি হয় দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব (Two step flow theory)। Elihu Katz এর সঙ্গে যৌথ গবেষণায় গণমাধ্যমের প্রভাব কে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। বুলেট তত্ত্ব কে অস্বীকার করে তৈরি করেন দ্বি-স্তর তত্ত্ব। বুলেট তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যা মিডিয়া বলবে তাই মানুষের মনে বুলেটের মতো গেঁথে যাবে। Lazarsfeld রা দেখলেন গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি বুলেটের মতো জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। গণমাধ্যমের বার্তা প্রথমে যাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। তারপর তা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থাৎ গণমাধ্যমের বার্তা দুটি স্তর পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে যাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। যেমন শিক্ষক ডাক্তার উকিলরা গণমাধ্যমের বার্তাকে ব্যাখ্যা করছেন সাধারণ মানুষের কাছে। এই ব্যাখ্যার যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের উপরে। নির্বাচনের সময় বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। ওপিনিয়ন লিডাররা সাধারণ ভোটারদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেন। এখানে সাধারণ জনগণ Passive হয়ে যায়। ওপিনিয়ন লিডাররা যা বলেন তার দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে এই বিষয়টি কিন্তু সমালোচনার উর্ধে নয়।

Deutschman G Danielson বলেছেন যে দ্বি-স্তর তত্ত্ব কিন্তু শেষ কথা হতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে তার কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও মানুষের আচরণকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারে না। সবসময়ই গণমাধ্যম-এর তথ্য ওপিনিয়ন লিডারদের মারফত হয় না। অনেক সময় সরাসরিও পৌঁছে যায়।

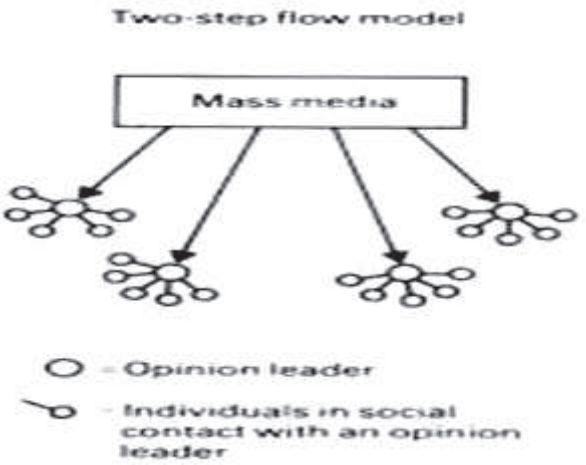

বহু স্তর প্রবাহ তত্ত্ব (Multi-Step Flow Theory)

দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্বের উন্নত রূপ হলো বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব। গণমাধ্যমের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের মাধ্যমে। দ্বিস্তরের এই রূপটি বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে যখন ওপিনিয়ন লিডাররা সমাজের বিভিন্ন প্রভাব এর অধীনে কাজ করে। রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, সমাজ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, প্রযুক্তি গভীর প্রভাব ফেলে ওপিনিয়ন লিডারদের ওপরে। যে কোনো বার্তা পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে দিয়ে পথ করে নেয়। বার্তার রূপান্তর প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। ওপিনিয়ন লিডাররা যাদের কাছে গণমাধ্যমের বার্তাকে ব্যাখ্যা করবেন তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিক্রিয়াও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ওপিনিয়ন লিডারদের সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ও মনস্তত্ত্বকে বিবেচনা করে এগোতে হয়। এভাবেই আসে বহুস্তর, বহু বিন্যাস যাকে বলা হচ্ছে বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব।

২.১.৫ জ্ঞাপন-এ পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব (Individual Difference Theory)

গণমাধ্যম এর বার্তা একভাবে পৌঁছয় না। একেক জন মানুষ একেক ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রত্যেক মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। ব্যক্তির মানসিক গঠন, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমের

সঙ্গে ব্যক্তির স্বতন্ত্র আন্তঃসম্পর্ককেই পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব বা Individual Difference Theory বলে অভিহিত করা হয়।

সাধারণ মানুষ যে গণমাধ্যমের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তার অন্যতম কারণ হলো তার নিজের প্রয়োজন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় টেলিভিশনে একজন দর্শক তার রুচি পছন্দ অনুযায়ী অনুষ্ঠান দেখবে। তার যদি সিরিয়াল দেখতে পছন্দ হয় সে সিরিয়াল দেখবে। খেলার অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ হলে সে সেটাই দেখবে। কেউ বেছে নিতে পারে সংবাদ-ধর্মী অনুষ্ঠান। এই পৃথক তত্ত্ব বেশি গুরুত্ব দেয় ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার উপরে।

মানুষ গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজনে। তার নিজের চাহিদা অনুযায়ী গণমাধ্যম এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো ,একই তথ্যকে মানুষ কিন্তু ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করতে পারে। যেমন একটি রাজনৈতিক সংবাদকে বিভিন্ন মানুষ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারে। এর প্রধান কারণ হলো মানুষের মস্তিষ্ক ফাঁকা নয় আগে থাকতেই তার মাথায় কিছু ধারণা, মতামত ও মূল্যবোধ থাকে। সেগুলো দিয়েই সে একটি তথ্যকে গ্রহণ করে। আবার গ্রহণ নাও করতে পারে।

এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সিলেক্টিভ এক্সপোজার থিওরি (Selective Exposure Theory), যা বলে, মানুষের মধ্যে যে বিশ্বাস মতামত ও ধারণা থাকে তা দিয়েই নির্বাচন করে কোন বিষয়টি সে গ্রহণ করবে আর কোনটি গ্রহণ করবে না। মানুষ শুধু নিজের পছন্দের বিষয়টি গ্রহণ করে না বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিও কেও সে বিচার করে। তার মতামত মূল্যবোধ সাংস্কৃতিক চেতনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয় বিষয়টিকে সে কিভাবে গ্রহণ করবে। গণমাধ্যম কিছু বললেই সে গ্রহণ করে না। নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নেয়। প্রয়োজন হলে নাও গ্রহণ করতে পারে।

২.১.৬ সারাংশ

জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দিকগুলির ওপর উদাহরণ সহযোগে আলোকপাত করা হয়েছে। যেকোনো বিষয়ের মতো জ্ঞাপন তত্ত্বের রূপরেখা সম্পর্কে বিশদ জানা থাকলে জ্ঞাপন এর চরিত্র ভালোভাবে বোঝা যাবে। তাত্ত্বিক দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিস্তর প্রবাহ ও বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব, পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স থিওরি।

২.১.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্ঞান তত্ত্বের গুরুত্ব কি?

২. দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব কি?

বড় প্রশ্ন

১. জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব বিষয়ে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. জ্ঞাপনের পৃথক দৃষ্টি পার্থক্য তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করুন।

২.১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice- Uma Narmla

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল বকানো (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। (লিপিকা)

একক ২ ◻ বিষয় নির্বাচন ও দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব, উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব, ব্যক্তি প্রভাব তত্ত্ব

গঠন

২.২.১ উদ্দেশ্য

২.২.২ বিষয় নির্বাচন ও দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব

২.২.৩ উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব

২.২.৪ ব্যক্তি প্রভাব তথ্য

২.২.৫ সারাংশ

২.২.৬ অনুশীলনী

২.২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.২.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- বিষয় নির্বাচন ও দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব
- উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব
- ব্যক্তি প্রভাব তত্ত্ব

২.২.২ বিষয় নির্বাচন ও দ্বার রক্ষার তত্ত্ব

গণমাধ্যম চর্চায় দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব (Gate Keeping) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার জন্য তৈরি হয়েছে এক তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত, যুক্তিসিদ্ধ তথ্য প্রয়োগে প্রমাণ করতে হয়েছে তার গুরুত্ব। বর্তমানে যে কোন গণমাধ্যমে দ্বার-রক্ষার বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

গণমাধ্যম এর বিষয় নির্বাচন হলো দ্বার রক্ষার কাজ। গণমাধ্যমের পরিচালন স্তরে এমন কিছু মানুষ থাকেন যারা ঠিক করেন কি পরিবেশিত হবে। বিষয় নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা হলেন দ্বাররক্ষী (Gate Keepers)। প্রতিটি গণমাধ্যমেই যেমন সংবাদপত্র, বেতার-টেলিভিশনে, পেশাদার ব্যক্তিরাই দ্বাররক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকেন। তারা ঠিক

করেন বিষয়বস্তুর বিপুল প্রবাহ থেকে কোন বিষয়গুলি গণমাধ্যমে পরিবেশিত হবে। বিষয় নির্বাচনে দ্বার-রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

গণমাধ্যম পরিবেশনার জন্য প্রচুর সংবাদ নানা প্রান্ত থেকে এসে নিউজডেস্কে পৌঁছায়। এত সংবাদকে কোন অবস্থাতেই পুরোপুরি জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রশ্ন উঠে নির্বাচনের। অভিজ্ঞ সাংবাদিকরা ঠিক করেন কোন কোন সংবাদ জায়গা করে নেবে পরিবেশনের জন্য। খবরের কাগজ বেতার-টেলিভিশনে প্রতিটি মাধ্যমেই সংবাদ নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় দ্বার-রক্ষা। আর যারা নির্বাচন করেন তারা হলেন দ্বাররক্ষী।

কুর্ট লিউইনের (Kurt Lewin) গবেষণার মধ্যে নিহিত আছে দ্বার রক্ষার ধারণাটি। লিউইন ছিলেন একজন সমাজ মনস্তাত্ত্বিদ। ১৯৪৭ সালের আয়াওয়া শহরের গৃহকর্তীদের খাদ্য সামগ্রী কেনার বিষয় নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। বাজারে পরিবারের গিন্নি গেছেন জিনিস কিনতে। কী কিনবেন তিনি? লেউইনের পর্যবেক্ষণ বলছে তিনি একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবেন। খাদ্যজ সামগ্রী কেনার সময় গিন্নি বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। ভেবে দেখেন কী কিনলে পরিবারের সদস্যদের পছন্দ হবে, স্বাদের পক্ষে উপকারী হবে ইত্যাদি। বিভিন্ন তথ্য যুক্ত থাকে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে। তথ্য বিশ্লেষণ করে ঠিক হয় কী কেনা হবে আর কী কেনা হবে না। যে পর্যায়ে এই নির্বাচনের কাজটি হয় লেউইন তাকে দ্বার-অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন। লেউইনের এই গবেষণা পরবর্তীকালে গণমাধ্যম চর্চাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৯৫০ সালে ডেভিড মেনিং হোয়াইট (David Manning White) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করেন। সাংবাদিকতার অধ্যাপক হোয়াইট আঞ্চলিক কাগজের সম্পাদকের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা চালান। তিনি দেখেন সম্পাদকের টেবিলে বিশাল সংবাদ প্রবাহ এসে জমা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ আসছে, নিজস্ব সংবাদদাতা, সরকারি প্রেস রিলিজ, সংবাদ-সংস্থার পাঠানো কপি। সিটি এডিটররা এই বিপুল সংবাদ প্রবাহ থেকে অল্প কিছু বেছে নিচ্ছেন। আর বেশির ভাগটাই ফেলে দিচ্ছেন। হোয়াইট চেনা কিছু আঞ্চলিক কাগজের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখলেন সম্পাদকরা সেই সমস্ত সংবাদই বেছে নিচ্ছেন যেগুলি কাগজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পাঠকের চাহিদা ও সম্পাদকের পছন্দ কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় এই প্রয়োজন। তিনি দেখলেন সম্পাদকের বিচারে মানবিক আগ্রহমূলক সংবাদি বেশি। হোয়াইট সম্পাদকদের "মিস্টার গেট" বলে অভিহিত করেছিলেন। সম্পাদকরা তাকে এক বাক্যে জানিয়েছিলেন "We, go for human interest stories in a big way". হোয়াইট জানিয়েছেন তার এই গবেষণায় লিউইনের গবেষণা সাহায্য করেছিল।

সুইডার(Suider) নামের এক গবেষক ১৯৬৭ সালে একই বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন বিষয়টি আগের মতই আছে অর্থাৎ সম্পাদকরা পাঠকদের রুচি পছন্দ ও কাগজের নীতির দ্বারাই প্রভাবিত হচ্ছেন। এরপরে গবেষকরা সংবাদ নির্বাচনে শুধুমাত্র সম্পাদকের ভূমিকার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি। স্যাম্পলিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বার-রক্ষার কাজে আরো বহু ব্যক্তিকে যুক্ত করেছেন। যেমন নির্বাহী সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, বিভাগীয় সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া হল এক দলীয় কার্যক্রম।

শুমেকার এবং রিজ (Shoemaker and Reise) বলেছেন দ্বার-রক্ষার কাজ কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের বক্তব্য হলো পাঠকদের চাহিদা ও বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গড়ে ওঠা সহমত দ্বার-রক্ষার কাজ কে

পরিচালিত করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল কে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। নির্বাচকরা যে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে গড়ে ওঠেন তার প্রভাব তাদের সিদ্ধান্তের ওপর পড়ে।

Shoemaker এবং Reise দ্বার-রক্ষার তত্ত্বে মূল্যবোধকে যুক্ত করেছেন। পাঠকদের চাহিদা, পছন্দের সঙ্গেও মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। যে সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে পাঠকরা গড়ে ওঠেন তার প্রভাব তাদের চাহিদার ওপরেও পড়ে। নির্বাচকরা সবসময়ই চাইবেন পাঠকদের চাহিদা মাফিক চলতে। অর্থাৎ পাঠকদের রুচি, পছন্দ, মূল্যবোধকে বিবেচনা করে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভারতের পাঠকদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠকের চাহিদা অবশ্যই আলাদা হবে।

গালটাঙ এবং রুজ (Galtung and Ruge) দ্বার-রক্ষা নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে দেখেছেন সাংগঠনিক ও আবেগগত বিষয়ক সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। নরওয়ের সংবাদপত্রে বিদেশি সংবাদ কীভাবে নির্বাচিত হয় তা অনুসন্ধান করার সময় এই দুই গবেষক লক্ষ্য করেন নির্বাচকরা সংবাদমূল্য দিয়েই সংবাদ বাছছেন। যে সংবাদ মূল্য নির্বাচকদের নিজস্ব পছন্দের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেই সংবাদকে তারা গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক নীতি ও আদর্শগত অবস্থান নির্বাচকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে তারা পশ্চিমী কাগজে, পশ্চিমী মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন।

ফিসম্যান (Fishman) বলেছেন সংবাদ এর মধ্যে যে বাস্তবতা রয়েছে তা নির্বাচকদের বাস্তব আন্তরিকতার সঙ্গে কতটা খাপ খাচ্ছে সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের কাছে যে সংবাদ আসছে, নির্বাচকদের ওপরে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। Fishman এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নির্বাচকদের চাহিদা, অপছন্দ সংবাদ নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রয়োজন হলে সংবাদমাধ্যম উদ্যোগ নিয়ে সংবাদ তৈরি করতেও এগিয়ে আসে (at times it also has to be internally manufactured or constructed)।

সংবাদ নির্বাচনের সময় যে বিষয়গুলি সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, সেগুলি হল মানুষ (people), স্থান (Place) এবং সময় (time)।

২.২.৩ উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব (Diffusion of innovation theory)

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ জর্জ গার্বনার (George Gerbner) জ্ঞাপন কে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক বিন্যাস-এর উৎস হল জ্ঞাপন। পারস্পারিক, দলগত এবং গণজ্ঞাপন প্রভৃতি সকল কাজের মধ্যে সর্বদাই সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে চলেছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে জ্ঞাপন এর মধ্যে দিয়ে। দলগত পর্যায়ে সম্পর্কের বিন্যাস ঘটছে জ্ঞাপন এর ওপর নির্ভর করে। এমনকি যন্ত্রনির্ভর গণজ্ঞাপন এর সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণ ঘটেই চলেছে। তৈরি হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের নতুন আধার। ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রূপ ধারণ করছে।

সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্রে জ্ঞাপন এর অবস্থান। অ্যারিস্টটল বলেছেন মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক জীব। মানুষ একা থাকতে পারে না। পাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চায়। এই সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে

জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে। নিজের কথা মানুষ জানাতে চায় অন্যকে। আবার অন্যের কথাও জানতে চায়। প্রত্যেকেই চাইছে একে অন্যের ভাবনার অংশীদার হতে। সহমর্মী হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করছে। এর ফলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এক সমজাতীয় মনোভাব। তৈরি হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক। মানুষ এভাবে একটা কমন আইডেন্টিটি খুঁজতে চাইছে।

Gerbner বলেছেন জ্ঞাপন ক্রিয়ার অন্যতম উপাদান হল বার্তা। এই বার্তাই ঠিক করে দেয় জ্ঞাপনের গতি, জ্ঞাপন এর বিষয়বস্তু বা তার মধ্যে যা যা থাকে সব কিছুই। প্রেরক গ্রাহকের কাছে বার্তা পাঠায়। এটি একটি জ্ঞাপন। বার্তা তৈরি করেন প্রেরক। বার্তার বিষয় ঠিক করার সময় বহু বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। গ্রাহক কেমন তা জানা দরকার। ঠিক তেমনি বার্তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তারও একটা আন্দাজ থাকা দরকার।

বার্তা হলো কিছু প্রতীকের সমষ্টি। মুখের কথা, লেখার ভাষা, টিভির ছবি সব নির্মিত হয় প্রতীকের সমন্বয়ে। প্রেরক ও গ্রাহক দুজনেই এই প্রতীকের অর্থ বোঝেন। পারস্পারিক এই বোঝাপড়া মিথষ্ক্রিয়া ঘটায়। এক বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে।

প্রত্যেক জ্ঞাপন এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রেরক জ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে পৌঁছতে চায়। পৌঁছতে পারলে তৈরি হবে প্রতিক্রিয়া। যার ওপর ভিত্তি করে পাওয়া যাবে প্রতিবার্তা। সেটা কেমন হবে তার একটা আন্দাজ থাকবে প্রেরকের কাছে। সেটা বুঝেই তিনি বার্তা তৈরি করবেন। এইভাবে চক্রাকারে জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে। বার্তা যেমন ছুটে যায় প্রেরক থেকে গ্রাহকের কাছে ঠিক তেমনই প্রতিবার্তা ছুটে আসে গ্রাহক থেকে প্রেরকের কাছে। তাই জ্ঞাপন কে বলা হয় দ্বিমুখী রাস্তা।

দুটি পথ দিয়ে জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে। গায়ক গাইছেন, শ্রোতা শুনছেন, শ্রোতার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছেন গায়ক। এভাবেই গায়ক এর সঙ্গে শ্রোতার মিথষ্ক্রিয়া ঘটছে।

Gerbner যে মডেল দিয়েছেন তাতে উৎস, মাধ্যম, প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু ও জ্ঞানের পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেকোনো জ্ঞাপনেই প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। Gerbner এই প্রতিক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রতিক্রিয়াই পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাতাবরণ তৈরি করে। প্রতিদিন সমাজে বিভিন্ন জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে সর্বক্ষণই তথ্যের আদান প্রদান বোঝাপড়া হয়ে চলেছে। আর তার মধ্যেই নিহিত আছে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। যাকে জ্ঞাপনবিদরা বলেছেন উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব।

২.২.৪ ব্যক্তি প্রভাব তথ্য (Personal Influence Theory)

গণমাধ্যম-এর পরিবেশিত বিষয়ের প্রতি সব মানুষ একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। একজন এককভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। খুনের ঘটনার সংবাদে কেউ আঁতকে ওঠে, কেউ খুনের শাস্তির দাবি করে, কেউ আবার মৃত্যদণ্ড চায়। আবার কেউ শাস্তি চায়, তবে তা কখনোই মৃত্যুদণ্ড নয়। এখানেই তৈরি হয় পার্থক্য, তত্ত্বের রূপ রেখার পার্থক্য। বসন্ত এসেছে, গাছে পলাশ চারিদিক রঙে রঙে ভরে উঠেছে, কেউ বলছে স্বাগত বসন্ত, আবার কেউ ভয় পাচ্ছে বসন্তের পরিণামে যে কোনো সময় ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

২.২.৫ সারাংশ

এই পর্যায়ে যে তাত্ত্বিক রূপরেখাগুলি আলোচিত হয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ দ্বার-রক্ষার, তত্ত্ব উদ্ভাবন ও মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব এবং ব্যক্তি প্রভাব তত্ত্ব। প্রতিটি তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষিত। জ্ঞাপন এর সঙ্গে সমাজে যোগাযোগের মাত্রাগুলি অনুধাবন করা যাবে এই তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে।

২.২.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব কী?

২. উদ্ভাবন মিথস্ক্রিয়া কী?

বড় প্রশ্ন

১. নির্বাচন এবং দ্বার রক্ষার তত্ত্ব উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. উদ্ভাবনী মিথস্ক্রিয়া তত্ত্ব বিশদে ব্যাখ্যা করুন।

২.২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice: Uma Narmla

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ): মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৬) আধুনিক গণমাধ্যম : ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)০

একক ৩ ◘ বিভিন্ন তত্ত্ব : কর্তৃত্ববাদী, উদারবাদী, সাম্যবাদী গণমাধ্যম, সামাজিক দায়বদ্ধতা

গঠন

২.৩.১ উদ্দেশ্য

২.৩.২ কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব

২.৩.৩ উদারনীতিক তত্ত্ব

২.৩.৪ সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্ব

২.৩.৫ সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব

২.৩.৬ সারাংশ

২.৩.৭ অনুশীলনী

২.৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব (Authoritarian Theory)
- উদারনীতিক তত্ত্ব (Libertarian Theory)
- সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্ব (Communist Media Theory)
- সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব (Social Responsibility Theory)

২.৩.২ কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব (Anthoritarian Theory)

সংবাদপত্র কীভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করে দেশের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে। ইউরোপের বহু দেশেই একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কর্তৃত্ববাদীরা মনে করতেন দেশের ভালো-মন্দ একজন একনায়কের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এবং এক অর্থে সেই এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে, কোনরকম বিরোধিতা ও সমালোচনার জায়গা থাকবে না।

সংবাদপত্রকেও এই কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। হিটলার ও মুসোলিনির আমলে যথাক্রমে জার্মানি ও ইতালিতে কর্তৃত্ববাদী ধারণার বিকাশ হয়েছিল, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর আমলেও কর্তৃত্ববাদীদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে না, শাসনক্ষমতার কোনরূপ সমালোচনার সুযোগ এখানে নেই। একনায়ক এর কর্তৃত্বকে সমর্থন করাই গণমাধ্যমের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

২.৩.৩ উদারনীতিক তত্ত্ব (Libertarian Theory)

গণতন্ত্রের কথা ধ্বনিত হয় উদারনৈতিক তত্ত্বে। সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। শাসক-বিরোধী ও সমালোচনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিরোধিতা ও সমালোচনাকে গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত বলে ধরা হয়। মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবে এবং সেইমতো অবস্থান করবে এটাই উদারনৈতিক দর্শনের মূল কথা। গণমাধ্যমের সাফল্য এই দর্শনের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে। গণমাধ্যম এর কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ হবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই উদারনীতিক তত্ত্বের দ্বারা গণমাধ্যম পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এই তত্ত্ব। মুক্তচিন্তার বিকাশ-এ সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাধা সৃষ্টি করে, এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বেসরকারি উদ্যোগের নেতিবাচক আচরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। মুনাফার লোভে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমাজের ক্ষতি করতে পারে এই দিকটা উপেক্ষিত থেকেছে।

২.৩.৪ সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্ব (Communist Media Theory)

সাম্যবাদী দেশে গণমাধ্যম সাম্যবাদী ভাবধারার আলোকে পরিচালিত হয়। মার্ক্সবাদী দর্শন হলো গণমাধ্যমের অনুপ্রেরণা। মার্কসীয় তত্ত্ব বলে শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। শোষণহীন সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে যাবার পথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন হবে। এবং এই রাষ্ট্রের সামাজিক উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। কোনরকম ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব থাকবে না। ব্যক্তির অধিকারের চেয়ে সামাজিক অধিকারকে বেশি মান্যতা দেওয়া হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। গণমাধ্যম এই ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে, মুনাফার জন্য নয়, সমষ্টিগতভাবে সামাজিক স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা কবে। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র এর উদ্দেশ্যই হল অর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে গণমাধ্যম কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ মেনে পরিচালিত হতো। কোন গণমাধ্যমই বেসরকারি মালিকানার অধীনে ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা ছিল 'প্রাভদা' আর সরকারের কাগজ ছিল 'ইজভেসতিয়া'। বর্তমানে চিনেও গণমাধ্যম সরকারের পরিচালনাধীন। 'পিপলস ডেইলি' চালায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

২.৩.৫ সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব (Social Responsibility Theory)

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা গড়ে ওঠে। উদারনৈতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কে সংশোধন করার চেষ্টা করে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সরকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং তাতেই সামাজিক মঙ্গল হবে, এই ধারণা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে। সামাজিক স্বার্থে

সংবাদপত্রকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সামাজিক মঙ্গল কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা ভাবতে হবে। এই হলো সামাজিক দায়বদ্ধতা। ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদপত্র যদি শুধু নিজের মুনাফার কথা ভাবে তাতে সংবাদপত্র ও প্রতিষ্ঠান আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও সাংবাদিকতার মান উন্নত হয় না। সাংবাদিকতার নীতি ও উদ্দেশ্য যদি বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় তাহলেই সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৯৪৯ সালে Hutchins Commision আমেরিকাতে মিডিয়ার কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে যে রিপোর্ট দিয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা। কমিশন বলেছিল গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল হতে হবে। তখন অবশ্য গণমাধ্যম বলতে প্রধানত সংবাদপত্রকে বোঝাত। অবশ্য সেই সময় বেতার জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে Wilbur Schramm সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করেন। এই গবেষণায় সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বড় হয়ে উঠেছিল।

২.৩.৬ সারাংশ

এখানে যে তাত্ত্বিক রূপরেখাগুলি আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব। উদারনৈতিক তত্ত্ব, সাম্যবাদী তত্ত্ব এবং গণমাধ্যম ও সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব। প্রতিটি তাত্ত্বিক রূপরেখা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দার্শনিক বিচারবোধকে আশ্রয় করে। ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন সময়ে সমাজকে প্রভাবিত করেছিল যে দার্শনিক প্রত্যয়গুলি তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন তত্ত্ব। তার পরিচয় এখানে রয়েছে।

২.৩.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কতৃত্ববাদী তত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২. সাম্যবাদী গণমাধ্যম এর উদ্দেশ্য কী?

বড় প্রশ্ন

১. গণতন্ত্রে কৃতিত্ববাদী তত্ত্বের ভূমিকা কী? এ বিষয়ে আপনার মত কী ব্যাখ্যা করুন।

২. সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২.৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলভিন এল দি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক ৪ ◘ উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব, কনভারজেন্স

গঠন

২.৪.১ উদ্দেশ্য

২.৪.২ উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব

২.৪.৩ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব

২.৪.৪ কনভারজেন্স

২.৪.৫ সারাংশ

২.৪.৬ অনুশীলনী

২.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব
- গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব
- কনভারজেন্স

২.৪.২ উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব (Development Theory)

গণমাধ্যম দেশকালের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। উদারনৈতিক ব্যবস্থার এক ভাবে কাজ করে। আবার সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষায় অন্য ভাবে কাজ করে। বিশেষ করে দেশকালের প্রেক্ষিতে সামাজিক চাহিদার তারতম্যের ফলে গণমাধ্যম কার্যধারায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের সীমাবদ্ধতাও প্রকট হয়ে ওঠে। এইসব সীমাবদ্ধতার কথা ভেবেই কয়েকজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ নতুন একটি তত্ত্বের রূপরেখা দিয়েছেন। এর নাম উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব (Development Media Theory)।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করে। তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন ছিল অন্যরকম। উন্নত দেশগুলির চাহিদা দিয়ে তাদের অবস্থা একেবারেই বোঝা যায় না। এই দেশগুলির বেশিরভাগই ছিল খুব গরিব।। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই ছিল তাদের কাছে প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়ন

তো চাইলেই পাওয়া যায় না তার জন্য প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ ও পর্যাপ্ত মূলধন। এইসব তাদের কিছুই ছিল না। তাই পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। McQuail– Altschull এবং Hachten বলেছেন এই পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সে সমস্ত দেশের গণমাধ্যমগুলোকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। গণমাধ্যমগুলির উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ নেবে। দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর সবচেয়ে প্রয়োজনী। সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা নিয়ে যেতে হবে। দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর সবচেয়ে প্রয়োজনী কোন অঞ্চলে কী রকম সেটা খতিয়ে দেখবে গণমাধ্যম।। গণমাধ্যম যদি সমস্যা গুলিকে চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে সরকারের নীতিনির্ধারকরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করতে পারে। এতে উন্নয়ন দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এই উন্নয়ন তত্ত্ব থেকেই উদ্ভূত হয় উন্নয়ন সাংবাদিকতা। সাংবাদিকরাও নিজেদের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল করবেন। সাংবাদিক হবে প্রশিক্ষিত, আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলিকে দ্রুত চিহ্নিত করতে শিখবেন। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়ন তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

বর্তমানে উন্নয়নের প্রসঙ্গে আরেকটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এর নাম টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development)। দ্রুত উন্নয়ন করতে গেলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন কৃষিতে দ্রুত উন্নয়ন করতে গেলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়বে, কীটনাশক ব্যবহার করে ফসল রক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। পাম্প ব্যবহার করে খেতে জল দেওয়া হবে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে বেশি ফসল পাওয়া সম্ভব হলেও ভবিষ্যতে তার খারাপ প্রভাব পড়বে। যেমন রাসায়নিক সার মাটির উর্বরা শক্তি নষ্ট করে। কীটনাশকের ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানি ঘটবে আর পাম্পের ব্যবহারে জলস্তর নেমে যাবে। আগামী দিনে ঘনিয়ে আসবে গভীর সংকট। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ভারতে দেখা দিয়েছিল তীব্র খাদ্য সংকট। ষাটের মাঝামাঝি বেশ কয়েকটি রাজ্যে তীব্র খরার ফলে শস্য উৎপাদন কমে গিয়েছিল। এই সমস্যা মোকাবিলা করতে পাঞ্জাব, হারিয়ানায় সবুজ বিপ্লবের স্লোগান তোলা হয়েছিল। উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও মাটির তলা থেকে প্রচুর জল তুলে ফসল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হয়েছিল সবুজ বিপ্লবের। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদী ফল ভালো হয়নি। মাটির উর্বরতা শক্তি কমেছে। জলস্তর কমে গেছে এবং স্বাস্থ্যের হানি হয়েছে। এ অবস্থায় টেকসই উন্নয়নের বা (Sustainable Development) এর গুরুত্ব বেড়েছে। জৈব সারের ব্যবহার করে উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এই উপলব্ধি মানুষের হয়েছে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার কমেছে। মাটির থেকে যথেচ্ছ জল না তুলে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসার করে কৃষিকাজের উন্নয়ন ঘটানো জরুরী বলে মনে করা হচ্ছে। আজকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশ রক্ষা করা। জীব বৈচিত্র কে যদি রক্ষা করা যায়, বাতাসে কার্বন এর উৎস যদি কমানো যায় তাহলে পরিবেশ রক্ষা পাবে। উন্নয়ন হবে টেকসই। লাগামহীন উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।

২.৪.৩ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব (Democratic Participation Theory)

গণতন্ত্র সফল হয় মানুষের অংশগ্রহণে। গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো মানুষ। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র তখনই সফল হয় যখন মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। রুশো (Rousseau) থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল এই গণতন্ত্রের কথাই বলেছেন।

বর্তমানে গণজ্ঞাপন চর্চায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্বের নতুন এক রূপরেখা পাওয়া যাচ্ছে। উদারনৈতিক তত্ত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার জন্য বর্তমানে সমস্ত গণমাধ্যম বিজ্ঞাপন নির্ভর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপন আসে প্রধানত পণ্যদ্রব্য নির্মাতাদের কাছ থেকে। ভোগ্য পণ্যের বাজারে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের জায়গা নেই। শুধু শহরাঞ্চলের ধনী বাজারে এটি সীমাবদ্ধ। তাই সমস্ত বিজ্ঞাপনের চেহারা আরবান (Urban)। মুষ্টিমেয় ধনী উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের বাজার নিয়ে বিজ্ঞাপনের কাজ কারবার। অন্যদিকে চাষী ক্ষেতমজুর শ্রমিকের জন্য বিজ্ঞাপনের কোনো মাথাব্যথা নেই। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সাধারণ গরিব মানুষের কোন স্থান নেই। এইসবই প্রান্তিক মানুষের প্রতি রয়েছে বাজারের অবহেলা।

সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হলো গণতন্ত্রের মূল পরিকাঠামো কিন্তু এইসব প্রান্তিক মানুষের হাতে থাকে। এইসব মানুষকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া দরকার। কিন্তু জাতপাতের সমস্যার জন্য উচ্চবর্ণের চাপে ও কৌশলে নিম্ন বর্ণের মানুষ ভোট দিতে পারে না। আমাদের দেশে এরকম উদাহরণ আছে। আমরা এসব জেনেছি গণমাধ্যম মারফত। উদ্বেগের বিষয়টি হলো এই পরিস্থিতি। দীর্ঘমেয়াদী অনুসন্ধানমূলক খবরের ছিটেফোটাও পাওয়া যায় না। ফলে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন চাহিদা কিছুই জানা যায় না। গণমাধ্যম এর নীতি ওপর থেকেই চালিত হয়।

সাধারণ মানুষের জনজীবনকে বুঝতে গেলে জনসংস্কৃতি কে বুঝতে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন বিচিত্র লোকসংস্কৃতি কে তুলে ধরা সম্ভব। আজ প্রান্তিক মানুষ এবং সংস্কৃতি বিপন্ন। যদিও বৃহৎ গণমাধ্যমে তা নিয়ে কোন চিন্তা নেই। জনজীবন বেঁচেথাকে সংস্কৃতির মধ্যে। ভাষা সংস্কৃতি যদি বিপন্ন হয় তাহলে বুঝতে হবে জনজীবন বিপন্ন।

বহুতত্ত্ববাদী ধারণাকে পুষ্ট করে ভাষা। সংস্কৃতির বৈচিত্রকে বজায় রেখে চললে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। মানুষ যদি নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারে তাহলেই গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সাফল্যমন্ডিত হতে পারে। শুধুমাত্র বাণিজ্যনির্ভর গণমাধ্যম দিয়ে এ কাজ হবে না।

২.৪.৪ কনভারজেন্স

বহুমাধ্যম একত্রিত হয়ে তৈরি করে কনভারজেন্স। এর প্রধান উৎস হলো ডিজিটাল মিডিয়া। পাওয়ারপয়েন্ট পরিবেশনায় কনভারজেন্স কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে যেকোনো সৃজনশীল কাজকে আরো অর্থবহ করে তুলতে পারে। গণ মাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো মাধ্যম হলো মুদ্রণ মাধ্যম। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বই বিপুল প্রভাব ফেলেছিল সমাজে। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মুদ্রণ মাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘদিন এই মাধ্যমটি রাজ্যপাট চালিয়েছে। সময়টা অনেক, প্রায় চার শতাব্দি। সপ্তদশ থেকে বিশ শতক, বিশ শতকেও তার দাপট যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তবে এই শতকে মুদ্রণের পাশাপাশি চলে এলো বেতার, টেলিভিশন ও সিনেমা। সিনেমার ম্যাজিক গভীর প্রভাব ফেলেছিল সমাজে।

টেলিভিশনের প্রভাব ছিল বিপুল। দৃশ্য এবং শ্রাব্য মাধ্যম হিসেবে দ্রুত মানুষের মন জয় করেছিল টেলিভিশন। গণমাধ্যম হয়ে উঠল অনেক বিশ্বাসযোগ্য। যেমনটি ঘটছে তেমনটাই দেখা সম্ভব করলো টেলিভিশন। টেলিভিশন শুরুতেই হয়ে উঠল গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট। এরপর এলো ভিডিও যা প্রাথমিক পর্বে ছিল অ্যানালগ। পরে হল ডিজিটাল। ছবির গুণগতমানের অভাবনীয় উন্নতি হল। দেখা ব্যাপারটাই অন্য মাত্রা পেল।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি আসার সঙ্গে সঙ্গেই গণমাধ্যমের চরিত্রটাই পাল্টে গেল। ইন্টারনেট নিয়ে এলো তথ্য বিপ্লব। আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল বিপুল তথ্য ভান্ডার। আগে তথ্য জানার জন্য লাইব্রেরী বা অন্যত্র ঢুঁ মারার প্রয়োজন ছিল। এখন তথ্য হাতের সামনে। কম্পিউটার বা মোবাইলে একটা ক্লিক করলেই হল। চাহিদামতো তথ্য হাজির ঘরে বসেই। এক কথায় বিশ্ব গ্রামের বাসিন্দা হয়ে উঠল গোটা সমাজ।

আমরা এখন ডিজিটাল যুগে বসবাস করছি। এ যুগের সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় হলো কনভারজেন্স। একই ফরম্যাটে অনেকগুলো ফরম্যাট এসে মিশেছে। ইচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো আমরা ভিডিও অডিও টেক্সট নিয়ে এসে যাচ্ছি ল্যাপটপের সামনে কখনো বা আইপ্যাডের পর্দায়। চাইলে এমনকি মোবাইলেও। শুধু এখানেই শেষ নয়, বর্তমানে সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র এবং বইও এসে গেছে মোবাইল ফোনের পর্দায়। একই পর্দায় বহুমাধ্যম। এটি হলো কনভারজেন্স। অনেক নদী এসে মিলছে এক অপূর্ব জলাশয়ে। প্রয়োজন এবং পাশাপাশি বিনোদন সবকিছুই মিটছে কনভারজেন্স এ।

বৈদ্যুতিন জ্ঞাপন ব্যবস্থার ওপর ডিজিটাল কনভারজেন্স এর বিপুল প্রভাব। জ্ঞাপন ব্যবস্থার চরিত্রটাই পাল্টে গেছে। জ্ঞাপন এর সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত হয়ে আছে মাধ্যম, বিশেষ করে গণমাধ্যম। গত কয়েক দশকে গণমাধ্যম কনভারজেন্সের প্রভাবে অনেক বর্ণময় হয়ে উঠেছে। বহু রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে। একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের কোথায় 'It has completely converged'.

সকালে চায়ের কাপ নিয়ে কাগজ পড়া মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন রুটিন। কিন্তু এখন এই রুটিন থাকলেও তার সীমানা বিস্তৃত হয়েছে। এখন আমরা মুদ্রিত সংবাদপত্র অনলাইনে পড়তে পারি। আগে যে সঙ্গীতানুষ্ঠান সিডিতে শুনতাম এখন তা যেকোনো সময়ে থ্রিডিতে রূপান্তরিত করে শুনতে পারি। ইউটিউবে গান শোনা নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা এক কথায় কনভারজেন্সের দৌলতে মিডিয়া আমার অনুগত। ইচ্ছে মতো তাকে ব্যবহার করা যায়।

যত দিন যাচ্ছে জ্ঞাপন স্ট্র্যাটেজির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কনভারজেন্স মিডিয়া ব্যবহারকে সম্প্রসারিত করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির আবির্ভাবে গণমাধ্যম-এর সমস্ত শাখাই বৈপ্লবিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে জ্ঞাপন এর সামগ্রিক চিত্রটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এই অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে স্ট্র্যাটেজি। কনভারজেন্স এই স্ট্রাটেজি নির্ধারণ বিষয়টিকে বর্ণময় করে তুলেছে। অনলাইনে লেখা, ছবি, মিউজিক, ভিডিও সমস্ত রকম তথ্যই প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শুধুমাত্র যুক্তিযুক্ত নির্বাচনে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে।

২.৪.৫ সারাংশ

একটা সময় গণমাধ্যম কার্যধারার উন্নয়ন হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞাপন এ উন্নয়ন কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উন্নয়ন গণমাধ্যম সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই প্রাসঙ্গিক ও জরুরি বিষয় হয়ে উঠেছে।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের বিষয়টি। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে যে তথ্য গড়ে উঠেছে তা একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে কাজ করে, তুলে ধরে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিবেদন দিয়ে কাজ হয়না। একেবারেই প্রান্ত নিবাসী মানুষের কাছে পৌঁছে খবর করতে হয়। উপর থেকে নিচ দেখার পরিবর্তে নিচ থেকে ওপরের দিকে দেখতে হয়।

বর্তমানে আমরা ডিজিটাল যুগে বসবাস করছি এই সময় গণমাধ্যমের চালচিত্র একেবারে পাল্টে গেছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘটেছে কনভারজেন্স। বহুমাধ্যম এসে মিলেছে একটি ফরম্যাটে। একটা মোবাইল ফোনের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংগীত আরো কত কী। ইচ্ছেমতো ব্যবহার করলেই হল। একেই বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায়।

২.৪.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

২. কনভারজেন্স কী?

৩. কনভারজেন্স কি গণমাধ্যমের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে? যুক্তি দিয়ে আলোচনা করুন।

২.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ১ ◘ জ্ঞাপন মডেল ধারণা, লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল। (রৈখিক এবং অরৈখিক মডেল) মৌখিক মডেল, আইকনিক মডেল, অ্যানালগ মডেল।

গঠন

৩.১.১ উদ্দেশ্য

৩.১.২ জ্ঞাপন মডেল ধারণা

৩.১.৩ লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল

৩.১.৪ মৌখিক মডেল

৩.১.৫ আইকনিক মডেল

৩.১.৬ অ্যানালগ মডেল

৩.১.৭ সারাংশ

৩.১.৮ অনুশীলনী

৩.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- জ্ঞাপন মডেল ধারণা
- লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল
- মৌখিক মডেল
- আইকনিক মডেল
- অ্যানালগ মডেল

৩.১.২ জ্ঞাপন মডেল ধারণা

মডেল কোনো ধারণা কে সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে।। জ্যামিতিক ভাবে উপস্থিত করা হয় ধারণাকে। লাইন টু লাইন ব্যাখ্যা বিষয়কে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়।

৩.১.৩ লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার মডেল

এক রৈখিক (Linear Model)

লিনিয়ার মডেল হলো এক রৈখিক মডেল। একটি রেখা সমান্তরাল গতিতে চলে। রেখা এক প্রান্ত থেকে সরাসরি অন্য প্রান্তে যায়। অ্যারিস্টটল মডেল মূলত এক রৈখিক মডেল।

দুই প্রান্তের মধ্যেই জ্ঞাপন সীমাবদ্ধ। বার্তা চলে সরলরেখার গতিতে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। গ্রিসের সেই সময়ে জ্ঞাপন সীমাবদ্ধ ছিল আলোচনা সভার মধ্যে। একজন মানুষ বলতেন এবং সবাই শুনতো। এক রৈখিক মডেলের প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছেন কিন্তু গ্রাহক কোন প্রতুত্তর পাঠাচ্ছেন না। জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে বাধা সবসময় থাকছে। বেতার এবং টেলিভিশন এর ক্ষেত্রে যে জ্ঞাপন ঘটে তা এক রৈখিক। তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না।

এক রৈখিক জ্ঞাপন এ দেখা যায় রাস্তা একমুখী। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছেন গ্রাহক তা গ্রহণ করছেন। সংবাদপত্র বেতার-টেলিভিশনে এমন একমুখী জ্ঞাপন দেখা যায়। যেখানে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না। আজকাল ফোন-ইন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানেও লাইন পেতে অনেক সময় লাগে।

সমান্তরাল চলে এই জ্ঞাপন। কোন জটিলতা নেই একেবারেই সহজ সরল। বিপণনে এবং জনসংযোগের এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সর্বদা বার্তা এসে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। মানুষ দেখছে বিজ্ঞাপন, নিজের প্রয়োজন মতো তা ব্যবহার করছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না।

ই-ব্যবস্থায় এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ই- মেল খুললেই আমরা অজস্র বিজ্ঞাপন পাই। অমুক জিনিস কিনুন, এই পরিষেবা নিন, এ রকম হাজারো বিজ্ঞাপন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন আমরা ঠিক করি কোনটা নেব।

বিজ্ঞাপন ব্যাপারটাই পুরোপুরি একমুখী জ্ঞাপন। বিপণনের জন্য অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। সব আমরা কিন্তু শুনছি না। বেশিরভাগটাই ফেলে দিচ্ছি। যেটা আমার প্রয়োজন শুধু সেটাই গ্রহণ করছি।

এই মডেলের প্রেরক, মাধ্যম এবং গ্রাহক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেরক বার্তা তৈরি করছে, বার্তার মধ্যে থাকছে প্রেরকের ভাবনা ও চিন্তা এবং তথ্য। তারপর এই বার্তা কোন একটি বিশেষ মাধ্যমের সাহায্যে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় বার্তা একটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করছে। যেমন কথা, গান, লিখিত ভাষা, অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স ইত্যাদি। গ্রাহকই বার্তা বুঝতে পারে।

মডেলটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নয়েজ বা বাধা থাকার সম্ভাবনা বেশি। নয়েজ সাধারণত জ্ঞাপনে বিঘ্ন ঘটায়। এর ফলে বার্তা বুঝতে অসুবিধা হয়। নয়েজ টেকনিক্যাল হতে পারে আবার সাইকোলজিক্যালও হতে পারে। বেতার

ও টিভির সম্প্রচার এ লিংক চলে গেলে হবে টেকনিক্যাল নয়েজ। অন্যদিকে ভাষার ও ছবির দুর্বোধ্যতা সাইকোলজিকাল নয়েজ তৈরি করতে পারে।

এই মডেলটি বিজনেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী। আজকাল ই-মেলে অজস্র বিজ্ঞাপন এসে হাজির হয়। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন আমরা দেখেও দেখিনা। অতি সামান্য বিজ্ঞাপন দেখি নিজের প্রয়োজনে। চেনা কিছু উল্লেখযোগ্য মডেলকে একরৈখিক মডেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলি হল লাসওয়েল মডেল, শ্যানন উইভার মডেল এবং বারলো মডেল।

এই মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমটি হল প্রতিবার্তার অনুপস্থিতি। প্রতিবার্তা ছাড়া জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় না। এক্ষেত্রে নয়েজের সম্ভাবনা বেশি। এতে জ্ঞাপনে বিঘ্ন ঘটে।

অ-রৈখিক মডেল মডেল (Non- Linear Model)

অরৈখিক জ্ঞাপন মডেলে রেখার আধিপত্য থাকেনা। এখানে মানসিক গঠনের প্রাধান্য অনেক বেশি। যে-কোনো বিষয় মস্তিষ্কে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তার ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এই মডেল হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে তার হদিশ পাওয়া যায়। একে বলে সার্কুলার মডেল। আন্তঃসম্পর্কের সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এই মডেলের যোগ নিবিড়। মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা অনুধাবন করতে পারলে জ্ঞাপন ক্রিয়া ভালোভাবে বোঝা যায়।

মডেলটির ভিত্তি হলো মস্তিষ্ক। এখানে কাজ চলে অনেক টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে। বেশ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। লিনিয়ার বা রৈখিক মডেলের মত সরলরেখায় তাকে পাওয়া যাবে না। নিরন্তর প্রতিবার্তা পাওয়ার ফলে জ্ঞাপন ক্রিয়ায় আসে জটিলতা। যেখানে রেখা চক্রাকারে অথবা বিভিন্ন গতিতে এগুতে থাকে। কারণ প্রতিবার্তা প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা যোগ করে। পরবর্তীকালে পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে গেলে বার্তার ধরণও বদলায় এবং এই পরিবর্তনের প্রভাব গোটা জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বেশি প্রাধান্য পায় অরৈখিক জ্ঞাপন এ। এই ধরনের জ্ঞাপনে সৃজনশীলতার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ এই জ্ঞানের উৎস থাকে মস্তিষ্কে। কখনো তা অসংলগ্ন হতে পারে যেমন স্বপ্ন, সার্থকতা পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি।

৩.১.৪ মৌখিক মডেল (Verbal Model)

কথাই মাধ্যম। শব্দ নির্ভর কথা দিয়েই জ্ঞাপন হয়। কথায় আছে 'কথা কইতে পারলে হয় কথা শতধারায় বয়'। কথা দিয়েই অনেক কিছুই জানানো যায়। শুধুমাত্র ব্যবহারিক নয়, শিল্পরুপও তৈরি করা যায়। মৌখিক মডেল এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল "A Verbal Model is a word equalisation that represents a real situation", এর অর্থ হল শব্দ কথা নির্মাণ করে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে পারে। তাই তৈরি হল মৌখিক মডেল। মৌখিক মডেলে পদ, সংখ্যার ব্যবহার হয়। এতে অত্যাধিক ব্যথা, যন্ত্রণা, কল্পনা সবই কথায় প্রকাশ করা যায়। উইল ডুরান্ট (Will Durant) বলেছেন মানুষ প্রথম আদিম যুগে কথা বলতে শিখেছিল। প্রথমে তার মুখে এসেছিল বিশেষ্য পদ। যেমন আগুন, বাড়ি, আকাশ, ঝরণা, নদী, পাহাড় ইত্যাদি।

মুখের কথার কোন সার্বজনীন রূপ নেই। কথার নির্মাণ হয় আঞ্চলিকতার প্রেক্ষায়। তাই কয়েক মাইল অন্তর মুখের ভাষা পাল্টে যায়। হুমায়ুন কবির দুই বাংলার মুখের ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন আঞ্চলিক প্রকৃতি মুখের ভাষার তারসাম্য আনে। জীবনযাপনেও তার প্রভাব পড়ে। সাংস্কৃতিক ভাবনা ও মূল্যবোধের পার্থক্য ঘটে। পূর্ববঙ্গের মুখের ভাষা আর পশ্চিমবঙ্গের কথ্য, ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিপুল। দুই বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান আলাদা। পূর্ব বাংলার বন্যা, ঝড় অনেক বেশি হয়। মানুষকে সর্বদাই জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয়। ঘর ভাঙ্গলে আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে হয়। তাই তার আঞ্চলিক গান এ ভাটিয়ালির সুর বাজে। তার সব গানই হয় জীবন কেন্দ্রিক। আর পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত শান্ত। তাই সেখানে বাউল দরবেশী ফকির গানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

মৌখিক মডেল ভাষাতত্ত্বের চর্চায় খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মডেলটিকে মূল্যায়ন করেছেন। Wenstop Yanger (১৯৭৮) এবং Tong (১৯৮০) বিভিন্ন ভাষাতত্ত্বের মূল্যের এবং পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনা ভাষাতত্ত্বের নিরিখে মডেলের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। গার্বনারের মডেলও মৌখিক মডেলের কথা বলে। এই মডেল এক রৈখিক বা লিনিয়ার।

৩.১.৫ আইকনিক মডেল (Iconic Model)

আইকনিক মডেল হল ডিজিটাল এজের মডেল। আইকন হচ্ছে ভাষার প্রতীক এবং অত্যন্ত আধুনিক। যা আন্তর্জাতিক স্তরে সকলেই বুঝতে পারে। প্রতীকের মধ্যে ভাষা সংযোগ পাওয়া যায়। প্রতীকের মধ্যে থাকবে ছবি যার অর্থ আন্তর্জাতিক স্তরে সকলেই বুঝতে পারবে। যেমন মোটর দুর্ঘটনা ব্যাখ্যা, ঝড়, আগুন ইত্যাদি এইসব দুর্যোগ পরিস্থিতি ছবির মধ্যে ধরা থাকবে। ছবির আইকনগুলো দেখেই বিশ্বজুড়ে সবাই বুঝতে পারবে বিপদের সংকেত।

আন্তর্জাতিক জ্ঞাপনে আইকনিক মডেলের গুরুত্ব অপরিসীম। খুব দ্রুত যে কোন বিষয়কে বোঝাতে এই জ্ঞাপন নতুন দিশা দেখায়। খুব সংক্ষিপ্ত সাধারণগ্রাহ্য প্রতীকের মাধ্যমে যে কোন বিষয়কে তুলে ধরা যায়। ছবি বা প্রতীক দেখেই আমরা বিষয়ের আন্দাজ পাই। এককথায় যেখানে ভাষা পৌঁছয় না সেখানে প্রতীক ভাষা খুব দ্রুত পৌছে যায়। এখানেই আইকনিক মডেলের সাফল্য। বিপর্যয়ের সময়ে এই মডেল বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। একেবারে যথাযথভাবে ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পাওয়া যায় এই মডেলে। অতিরিক্ত কোনো কিছুর সংযোজনের সম্ভাবনা নেই। প্রতীক দেখামাত্র জ্ঞাপন ঘটে। মডেলের প্রতীক ছবি দেখে বিপদ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আজকাল ইমেজি দিয়ে মনের ভাবনাকে সকলেই প্রকাশ করছে।

৩.১.৬ অ্যানালগ মডেল (Analog Model)

অ্যানালগ হলো প্রযুক্তিনির্ভর সম্প্রচার পদ্ধতি। ক্রমাগত প্রতীকের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ হয়। শব্দ ছবি ও কথা নিয়ে তৈরি হয় তথ্য। বেতার এবং টেলিভিশনে এভাবেই ঘটে তথ্য-সম্প্রচার। অ্যানালগ মডুলেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে এই সম্প্রচার সংঘটিত হয়। মডিউলেশন দুরকম হতে পারে- ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশন সংক্ষেপে যাকে এফ.এম বলে

অভিহিত করা হয় এবং অন্যটি হলো এমপ্লিচুড মডিউলেশন এটিকে আবার এ.এম বলে অভিহিত করা হয়। আবার কখনো সম্প্রচারে মডুলেশন নাও থাকতে পারে। বেতার সম্প্রচারের এফ.এম এবং এ.এম ব্যবহৃত হয়। খুব ছোট জায়গার জন্য এফ.এম সম্প্রচার প্রভূত সাফল্য পেয়েছে। ফ্রিকুয়েন্সি মাত্রা ভালো হওয়ার জন্য এফএম সম্প্রচারে নয়েজের সম্ভাবনা কম হয় এবং অনেক ভালো শোনা যায়।

সম্প্রচার যখন বিস্তৃত জায়গার জন্য হয় তখন A.M. সম্প্রচারের সাহায্য নেওয়া হয়। এখানে নয়েজ এর সম্ভাবনা বেশি থাকে। বেতার এবং টেলিভিশন সম্প্রচার এবং টেলিফোনে কথাবার্তা ছিল অ্যানালগ পদ্ধতি নির্ভর। পরে তারা ডিজিটাল পদ্ধতি নির্ভর হয়ে ওঠে। অন্যান্য মডেল যে পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় তা অনেক সময় এবং একই সাথে কম খরচ সাপেক্ষ।

এই অ্যানালগ মডেলের অনেকগুলি রূপ পাওয়া যায়। যা প্রধানত এর ভিত্তি রূপকে উপস্থাপিত করে। সম্প্রচার ক্রিয়ার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় এখানে।

অ্যানালগ মডেলসমূহ উপস্থিত করে একটি 'Physical Process' কে। এই প্রসেস এর মধ্যে যে উপাদান গুলো ব্যবহৃত হয় তা অ্যানালগ অর্থাৎ অনুরূপ। প্রক্রিয়ার মধ্যে এই অনুরূপ উপাদানগুলিকে পাওয়া যায়। ভালো অ্যানালগ মডেলসমূহ সিস্টেম মডেলস-এর চেয়ে নিচু স্বরে প্রকৃত ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে উপস্থিত করতে পারে। যেমন ধরা যাক শক্তির এনার্জি ব্যবহার অনুরূপ উপাদান গুলির মধ্যে দেখা যায়। তবে এদের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে তা কিন্তু মডেলের বহিরঙ্গে সহজে ধরা যায় না।

A.V. Hill ১৯৩০ সালে এই মডেল সম্পর্কিত একটি রূপ রেখার সন্ধান দেন। মানবদেহের গঠনের ভিত্তি হলো কতগুলি হাড় সমৃদ্ধ কঙ্কাল। এর ওপরে তৈরি হয়েছে মানব দেহ, মাংসপেশির সমন্বয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে এক শক্তির উৎস। শক্তি মাসেলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। দেহের সঞ্চালনকে কার্যকারী করে এই শক্তি। দেহের পেশী সমূহের কার্যকারীতাকে যদি বোঝা যায় তাহলে অনুরূপ উপাদানগুলিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে। সমস্ত উপাদান গুলির সমন্বয়ে জড়ো হয় এক অখণ্ড শক্তি যা দেহকে সাফল্যের সঙ্গে চালনা করে।

সম্প্রচার ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে বুঝতে অ্যানালগ মডেলের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পেশির সঞ্চালনার মতন সম্প্রচার ব্যাবস্থাও গড়ে ওঠে আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে।

৩.১.৭ সারাংশ

জ্ঞাপন এর চরিত্র ভালোভাবে বোঝার জন্য মডেল তৈরি হয়েছে। মডেলের ধারণা তিনটি আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে।

জ্ঞাপন-এর প্রাথমিক রূপ হলো রৈখিক এবং অরৈখিক, এবং মৌখিক অমৌখিক এছাড়াও আইকনিক এবং অ্যানালগ মডেল বিশ্লেষিত হয়েছে। মডেলের সঙ্গে যোগ রয়েছে চিত্রের, যার সাহায্যে জ্ঞাপন কাজকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। যেমন রৈখিক মডেলের লাইনের গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যায়। জ্ঞাপন যেখানে সরলরেখাকে অনুসরণ করে যেমন এস এম আর সি মডেল। এভাবেই আলোচিত হয় অরৈখিক যা বক্রতাকে তুলে ধরে। তারপর অন্য দুটি মডেল যথাক্রমে আইকনিক ও অ্যানালগ আলোচিত হয়েছে।

৩.১.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্ঞাপন মডেল কী?

২. রৈখিক মডেল কী?

৩. অরৈখিক মডেল কী?

বড় প্রশ্ন

১. জ্ঞাপন এর ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. মৌখিক মডেল ব্যাখ্যা করুন।

৩. আইকনিক মডেল আলোচনা করুন।

৪. অ্যানালগ মডেল ব্যাখ্যা করুন।

৩.১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলভিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) গণজ্ঞাপন : ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ২ ◘ অ্যারিস্টোটল মডেল, লাসওয়েল মডেল, ওসগুড মডেল, স্ক্রাম মডেল, গাবর্নর মডেল

গঠন

৩.২.১ উদ্দেশ্য

৩.২.২ অ্যারিস্টোটল মডেল

৩.২.৩ লাসওয়েল মডেল

৩.২.৪ ওসগুড মডেল

৩.২.৫ স্ক্রাম মডেল

৩.২.৬ গাবর্নর মডেল

৩.২.৭ সারাংশ

৩.২.৮ অনুশীলনী

৩.২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.২.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- অ্যারিস্টটল মডেল
- লাসওয়েল মডেল
- ওসগুড মডেল
- স্ক্রাম মডেল
- গাবর্নার মডেল

৩.২.২ অ্যারিস্টটল মডেল

সবচেয়ে প্রাচীন জ্ঞাপন মডেল হল অ্যারিস্টটল মডেল। প্রায় ২৩০০ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তার 'Rhetoric' গ্রন্থে এই মডেলটি উল্লেখ করেছিলেন। এই মডেলে তিনি পাঁচটি উপাদান এর কথা বলেছিলেন। এগুলি হল যথাক্রমে বক্তা, বক্তৃতা, শ্রোতা, প্রভাব এবং উপলক্ষ।

প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞাপনচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল আলোচনার মধ্যে। যাকে বলা যায় ডিসকোর্স। অ্যারিস্টটল আলোচনা সভার প্রেক্ষিতেই তার মডেল তৈরি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বক্তাকে পরিস্থিতি বিবেচনা করে বক্তৃতা তৈরি করতে সাহায্য করা। শ্রোতার ওপর তার প্রভাব কী হবে তা বিবেচনা করেই বক্তা বার্তা তৈরি করবেন। এই প্রভাব কার্যকারী হবে একটি বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। আলোচনা সভার মধ্যেই রয়েছে এই মডেলের প্রাসঙ্গিকতা। আধুনিক জটিল জ্ঞাপন ক্রিয়াকে বোঝা যাবে না এই সরলরৈখিক মডেল দিয়ে।

বক্তা - বক্তৃতা - শ্রোতা - প্রভাব - উপলক্ষ

এই পাঁচটি উপাদানে তৈরি করছে একরৈখিক মডেলকে।

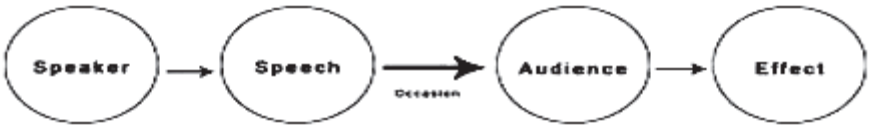

ARISTOTLE'S MODEL OF COMMUNICATION

৩.২.৩ লাসওয়েল মডেল (Harold Lasswell Model)

হারল্ড লাসওয়েল এই মডেলটির অবতারণা করেছিলেন ১৯৪৮ সালে। এই মডেলের মূল বিষয়টি ছিল কে, কাকে, কী মাধ্যমে, কী বললো, এবং তার ফলে কী প্রতিক্রিয়া হলো।

(Who, said what, by what channel, to whom, and with what effect)

এই মডেল তথ্য প্রবাহকে বহুমুখী সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মতামত ও ভাবনা প্রভাবিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমের সাহায্যে। তথ্যের আদান প্রদানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শ্রোতৃ মন্ডলী। বহুমুখী সমাজের প্রেক্ষাপটে জ্ঞাপন এর বিচিত্র কার্যধারা বুঝতে এই মডেল সাহায্য করে।

মডেল অনুসারে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে 'কে' এর প্রতি। চিনতে হবে কে বার্তা পাঠাচ্ছে। বার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টিকে কে হাতে রেখেছে। কোন অবস্থানের সঙ্গে বার্তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কযুক্ত। 'কী' দিয়ে বোঝা যাবে বার্তার চরিত্র। আলোচনার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে কোন ধরনের বার্তা পাঠানো হচ্ছে। বার্তার বিষয় অনুধাবনের দিকটিকে গবেষণার ভাষায় বলা হয় কনটেন্ট অ্যানালাইসিস। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জানা যায় বিষয়বস্তুর তাৎপর্য। এরপর আসবে মাধ্যম। দেখতে হবে কোন মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। জ্ঞাপন ক্রিয়ায় মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ করলে জ্ঞাপন বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে। কাকে বলা হচ্ছে সেটাও খুব জরুরী। বার্তাটি সবার

কাছে গিয়ে পৌঁছেছে এবং তাদের পরিচয় জানতে সাহায্য করছে। গ্রহীতার পছন্দ, চাহিদা, অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুই যা তাদের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করবে সেটি হল প্রতিক্রিয়া। বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতার একটি প্রতিক্রিয়া হবে। এই প্রতিক্রিয়া টা জানা গেলে জ্ঞাপন পদ্ধতির সামগ্রিক রূপটি পরিষ্কার হবে। জ্ঞাপন ক্রিয়া বুঝতে এই প্রতিক্রিয়া উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লাসওয়েল যখন এই তত্ত্বের অবতারণা করেন তখন তিনি রেখাচিত্রের সাহায্য নেন নি। পরবর্তীকালে মাইকেল বুলার রেখাচিত্রের মাধ্যমে মডেল মাটিকে আরো উন্নত করেন। রেখাচিত্রটি প্রত্যেকটি উপাদানকে যথাযথভাবে উপস্থিত করে।

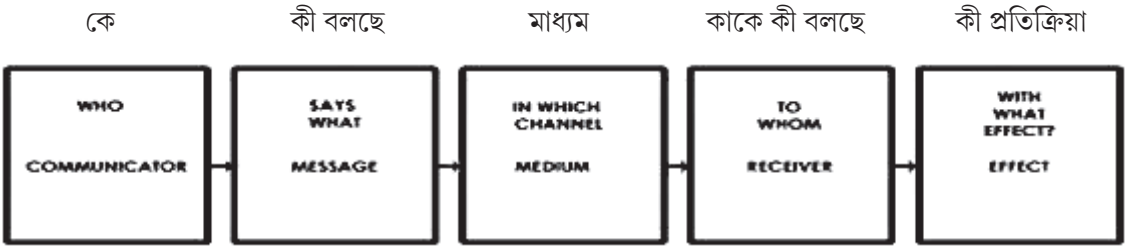

আচরণবাদী তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে তিনি এই মডেলের উপস্থাপনা করেন। নৈতিক পরিস্থিতিকে বুঝতে সাধারণ মানুষের আচরণও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে লাসওয়েল রাষ্ট্র নেতাদের বক্তৃতা সাধারণ মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রুজভেল্ট, চার্চিল, হিটলারের বক্তৃতা মানুষের কাছে কি বার্তা বয়ে এনেছিল তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লাসওয়েল এই জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার সন্ধান পান। প্রাথমিকভাবে যা ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পরে তাই হয়ে ওঠে জ্ঞাপনচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ।

৩.২.৪ ওসগুড মডেল (Osgood Model)

এই মডেল জ্ঞাপনের ধারণাকে আরো সুসংহত করে। কতগুলি বক্স এবং তার চিহ্ন ব্যবহার করে ডান্স প্রবর্তিত চক্রাকার মডেলের অনুকরণে তিনি নয়েজ এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ওসগুড মডেল এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বিরামহীন ক্রমশ নয়েজের পরিমাণ কমতে থাকা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া। পরস্পরের জানার যত সুযোগ বাড়বে পরস্পরের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার তাগিদে বাড়বে। এর ফলে প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে। একজন আরেকজনকে যত ভালোভাবে বুঝবে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাবে। চক্রাকারে জ্ঞাপন ক্রিয়া যত নিচের দিকে নামবে ব্যক্তিত্বের বক্স তত বড় হবে এবং নয়জের ছোট হবে।

দু দিকে ব্যক্তিত্ব অথবা পার্সোনালিটি, একজন ব্যক্তি প্রেরক ও অন্যজন গ্রহীতা। প্রথমে এনকোডিং তারপর ইন্টারপ্রিটেশন শেষে ডিকোডিং। এরপর তৈরি হলো মেসেজ। যা আমরা পাচ্ছি দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃত্তে। তারপর মেসেজ যায় গ্রহীতার কাছে। যেখানে অর্থাৎ পরের বৃত্তে প্রথমে decoding তারপর interpretation, এরপর গ্রহীতা ওই মেসেজ সম্পর্কে

তার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। সেটা আবার তিনি এনকোড করছেন। তৈরী হচ্ছে তার মেসেজ যা আমরা শেষ বৃত্তে পাচ্ছি। বার্তা বা মেসেজ ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। যত যোগাযোগ বাড়বে মাধ্যখানের নয়েস বক্স ততো ছোট হবে। ছোট বৃত্তের মাধ্যমে সেটি বোঝানো হয়েছে।

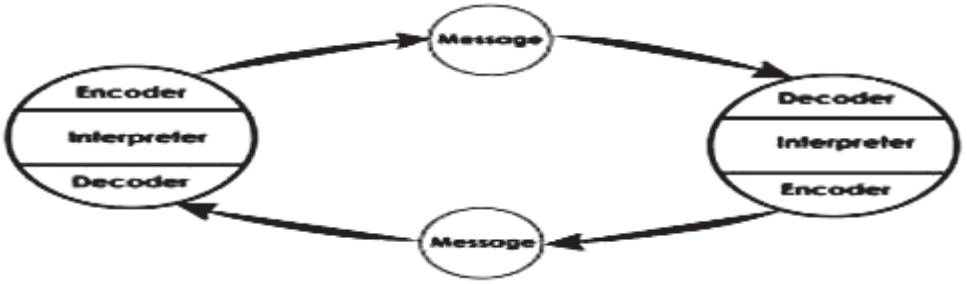

৩.২.৫ স্ক্রাম মডেল (Schramm Model)

উইলবার স্ক্রাম ১৯৫৪ সালে এই মডেলটির অবতারণা করেন। এটি হলো দ্বিমুখী চক্রাকার জ্ঞাপন (two way circular communication), এখানে জ্ঞাপন ঘটে প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে। স্ক্রাম মূলত এনকোডিং এবং ডিকোডিং এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই এনকোডিং এবং ডিকোডিং এর ব্যাপারটি জ্ঞাপনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন ব্যক্তি কীভাবে এনকোড করছে এবং অন্য একজন কীভাবে ডিকোড করছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এনকোডিং বার্তা তৈরি করে আর ডিকোডিং এ বার্তার পুনর্নির্মাণ ঘটে অর্থাৎ বার্তা নির্মাণ পূর্ণতা পায়। সোজা কথায় এর অর্থ হল একজন বলছে এবং অন্যজন শুনছে। একজন যদি বলে আগুন আর অন্যজন যদি আগুনের তাৎপর্য বুঝতে পারে তাহলেই জ্ঞাপন সফল হবে।

স্ক্রাম বলেছেন বার্তার (message) অর্থ denotative এবং connotative দুই হতে পারে। Denotative এর অর্থ হলো যে বিষয়টি গঠিত হচ্ছে তা যেন সবাই বোঝে এবং গ্রহণ করে। Cannotative এর অর্থ হলো বিষয়টি সম্পর্কে এক ব্যক্তির অনুধাবন অন্য ব্যক্তির অনুধাবনের থেকে আলাদা হতে পারে।

এই মডেল জ্ঞাপনকে বিরামহীন প্রক্রিয়া বলে ঘোষণা করে। বিরামহীন এর অর্থ হল চলতেই থাকে, শেষ হয় না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জ্ঞাপন ক্রিয়া কিন্তু চলতেই থাকে, ফলে ঘটতে থাকে, অন্তহীন সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। পারস্পারিক, দলগত এবং গণজ্ঞাপন এক বিরামহীন প্রক্রিয়ার মধ্যে চলতে থাকে এবং সমাজের মূল চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায় জ্ঞাপন। তথ্যকে শব্দে রূপান্তরিত না করলে এবং তা একজন আরেকজনকে না বললে অথবা অন্য কোনভাবে না জানালে তথ্যের অস্তিত্বের কোন অর্থই হয় না। একজন আরেকজনকে জানাচ্ছে মানেই সেখানে প্রথমে আসে এনকোডিং আর তারপর আসে ডিকোডিং। প্রথমে এনকোডিং এরপর বার্তা ডিকোডিং এর মাধ্যমে তা গৃহীত হচ্ছে। শুধুমাত্র গ্রহণ করলে হবে না, বুঝতে হবে প্রেরক কী বলতে চাইছে। স্ক্রাম বলেছেন জ্ঞাপনে এনকোডিং এবং ডিকোডিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি কাজ যদি ঠিকমত না হয় তাহলে জ্ঞাপন এর কোন মানেই হয়না।

স্ক্রাম অবশ্য আরো বলেছেন প্রতিবার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যিনি বার্তা পাঠাচ্ছেন তাকে অবশ্যই পেতে হবে প্রতিবার্তা। এটা না পেলে তিনি বুঝতে পারবেন না বার্তার প্রতিক্রিয়া। ফলে জ্ঞাপন হবে অসম্পূর্ণ। উদাহরণ দিয়ে

বলা যায় একজন তার বন্ধুকে বলল চলো একটি সিনেমা দেখে আসি। বন্ধুটি যদি কোন উত্তর না দেয় তাহলে ধরে নিতে হবে জ্ঞাপন সার্থক হয়নি। স্ক্রামের মডেলের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানে মধ্যে অর্থবহ জ্ঞাপনকে প্রতিষ্ঠা করা।

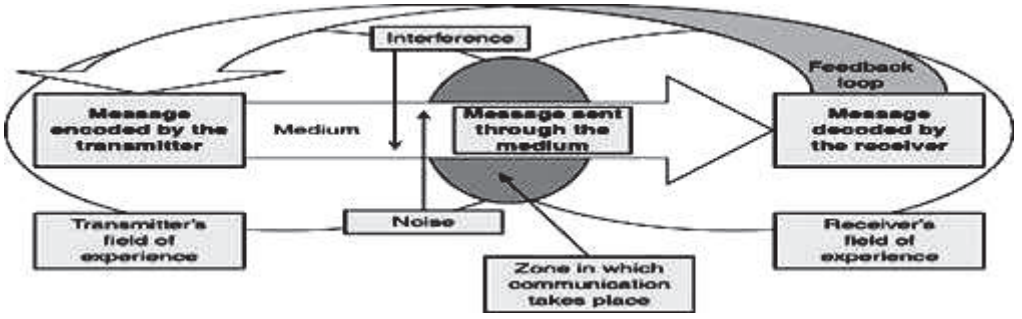

ছবি সৌজন্যে - The Schramm Model of Communication By- Jim Blyth

উপরের ছবিতে স্ক্রামের প্রবর্তিত মডেলের বিষয়বস্তু যথাযথ ভাবে উপস্থিত হয়েছে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে জ্ঞাপন যাচ্ছে। প্রথম ক্ষেপে মেসেজ এনকোড হচ্ছে। অর্থাৎ প্রেরক বার্তা তৈরি করছেন। তারপর তারা যাচ্ছে মাধ্যমে। দ্বিতীয় ক্ষেপে মাধ্যম মেসেজ পাঠাচ্ছে। এরপর তীর চিহ্ন এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে মেসেজ গিয়ে পৌঁছেছে গ্রহীতার কাছে। নিচের দিকে চারটি খোপ রয়েছে। বা দিকের দিকটি হলো প্রেরকের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়টি হল বা চিহ্ন দিয়ে মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। নয়েজ কম হলে মেসেজ ভালোভাবে গিয়ে পৌঁছবে। আর নয়েস হলে জ্ঞাপনে বিঘ্ন ঘটবে। উপরে ইন্টারফারেন্স-এর একটি ছোট্ট খোপ দেখা যাচ্ছে, Noise হলে interference এর মাত্রা বাড়াতে পারে। একটি ডিমের আকৃতির ছবি দেখা যাচ্ছে যেটা ধরে রাখছে মাধ্যম দ্বারা মেসেজ পাঠানোর প্রক্রিয়াকে। এখানেও নয়েজ যুক্ত হয়ে আছে। আবার প্রেরকের যে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র তার সঙ্গেও নয়েজের যোগ থাকতে পারে। গ্রহীতা তার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে মেসেজ গ্রহণ করছেন। এখানেও নয়েজের যোগ থাকতে পারে। রিসিভার ফিল্ড অফ এক্সপেরিয়েন্স এর যুক্ত হয়ে আছে ডিম্বাকৃতির নয়েজ এর সঙ্গে। অর্থাৎ নয়েজ প্রেরকের দিক থেকেও আসতে পারে। আবার গ্রহীতার সঙ্গেও তার যোগ থাকতে পারে। ছবিতে ফিডব্যাক লুপ দেখা যাচ্ছে। যেটা গ্রহীতা পাঠাচ্ছে প্রেরকের কাছে। একেবারে তলার দিকে একটি খোপে দেখানো হচ্ছে Zone in which Communication takes place, কীভাবে জ্ঞাপন ঘটছে তার সঙ্গেও নয়েজের যোগ থাকতে পারে।

স্ক্রাম এই মডেলে প্রতিক্রিয়ার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নয়েজ যদি বেশি হয় প্রতিক্রিয়া পরিষ্কার বা স্পষ্ট হবে না। আবার নয়েজ কম হলে জ্ঞাপন সফল হবে। জ্ঞাপন ক্রিয়া বোঝার জন্য মডেলটির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২.৬ গার্বনার মডেল (Gerbner Model)

জর্জ গার্বনার ১৯৫৬ সালে জ্ঞাপন ক্রিয়া কে ব্যাখ্যা করেন একটি মডেল এর মাধ্যমে। তিনি জ্ঞাপন ক্রিয়ার মধ্যে যে উপাদানগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন সেগুলি হল উৎস (source), কোনো মাধ্যমের মধ্য

দিয়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে উৎসের প্রতিক্রিয়া (The source reacts to the event in a situation through some channel), এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ও প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু (Subject matter in a given situation and perspective) এবং জ্ঞাপন এর পরিণতি (Consequences of communication)।

গার্বনার জ্ঞাপন-এ বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্ঞাপন কেমন হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে এই দুটি বিষয়ের উপরে- প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছে এবং গ্রহীতা তা গ্রহণ করছে। এই দুটি বিষয় ঘটছে এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে। পরিস্থিতি তৈরি হয় একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের আধারে। সংক্ষিপ্তকারে গার্বনার মডেলটি এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: কেউ একটি ঘটনাকে বুঝে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং তা ঘটে একটি মাধ্যমকে আশ্রয় করে।

নিচে ছবির মাধ্যমে মডেলটি ব্যাখ্যা করা হলো :

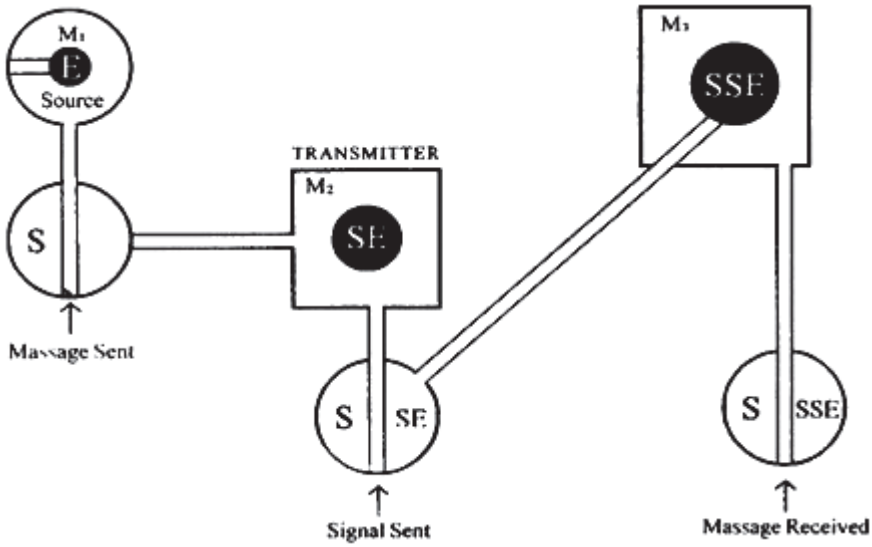

M1 হচ্ছে উৎস। M2 হল বাহক যন্ত্র আর M3 হল গ্রহীতা। E হল M এর দেখা ঘটনা। S হচ্ছে প্রেরিত সংকেত। যে এই বিবৃতি সম্পর্কে বলছে। SE হলো ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি। SSE হল প্রেরিত সংকেত যা বিবৃতি সম্পর্কে বলছে। SSEE হল সেই বার্তা যা গ্রহীতা উপলব্ধি করছে। এই মডেল শ্রাব্য এবং দৃশ্য, (Audio- Visual), জ্ঞাপন এর ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। টেলিভিশনে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা মডেল-এ উল্লেখিত প্রতিটি স্তরকেই ছুঁয়ে যায়। একটি ঘটনা সম্পর্কে যে বিবৃতি দর্শকের কাছে পৌঁছয় তা দর্শক মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিত এই দুই পরিস্থিতি জ্ঞাপনে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

৩.২.৭ সারাংশ

এখানে আলোচিত হয়েছে অ্যারিস্টটল মডেল, লাসওয়েল মডেল, ওসগুড মডেল, স্ক্রাম মডেল এবং গার্বনার মডেল। প্রত্যেক মডেলের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অ্যারিস্টটল মডেল সরলরৈখিক, প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে

সম্পর্ক স্থাপন করে। এস এম সি আর মডেলের উৎস এখানে পাওয়া যায়। লাসওয়েল মডেলে দেখতে পাই আচরণবাদ, কীভাবে কে কাকে কী মাধ্যমে কি বলল তার পরিচয় করিয়ে দেয়, সাধারণ মানুষের উপর বক্তার কী প্রভাব। এভাবে জানা যাচ্ছে লাসওয়েল মডেল মানুষের আচরণে কীভাবে প্রভাব ফেলছে। ওসগুড মডেলে নয়েজ এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে জ্ঞাপন ক্রিয়ায় ব্যক্তির প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়েজ কমতে থাকে।

স্ক্রাম মডেল হলো দ্বিমুখী চক্রাকার জ্ঞাপন ক্রিয়া। স্ক্রাম এনকোডিং এবং ডিকোডিং এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কীভাবে এনকোডিং হচ্ছে এবং তারপর কীভাবে অন্যজন ডিকোডিং করছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্ক্রামের মতে এই জ্ঞাপন বিরামহীন অর্থাৎ চলতেই থাকে।

গার্বনার জ্ঞাপন এর মধ্যে যে উপাদানগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উৎসের প্রতিক্রিয়া। এক বিশেষ পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয়েছে বিষয়বস্তু এবং জ্ঞাপন এর পরিণতি। ছবি দিয়ে জ্ঞাপন প্রক্রিয়াটি বোঝানো হয়েছে।

৩.২.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অ্যারিস্টটল মডেল কী?

২. এম এস আর সি কি রৈখিক মডেল?

৩. লাসওয়েল মডেল সংক্ষেপে লিখুন।

বড় প্রশ্ন

১. লাসওয়েল মডেলের সঙ্গে কি আচরণবাদের যোগ রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

২. ওসগুড মডেল আলোচনা করুন।

৩. স্ক্রাম মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।

৪. জ্ঞাপন এ গার্বনার মডেলটি ব্যাখ্যা করুন এবং তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৩.২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলভিন এল দি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) আধুনিক গণমাধ্যম - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৩ ◘ বার্লো মডেল, শ্যানন ওয়েভার মডেল, দে ফ্ল্যার মডেল, দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল

গঠন

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

৩.৩.২ বার্লো মডেল

৩.৩.৩ শ্যানন ওয়েভার মডেল

৩.৩.৪ দে ফ্ল্যার মডেল

৩.৩.৫ দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল

৩.৩.৬ সারাংশ

৩.৩.৭ অনুশীলনী

৩.৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- বার্লো মডেল
- শ্যানন ওয়েভার মডেল
- দে ফ্ল্যার মডেল
- দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল

৩.৩.২ বার্লো মডেল (Berlo Model)

Berlo Model SMCR মডেল জ্ঞাপন পদ্ধতিকে খুব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে। মাত্র চারটি উপাদান পাওয়া যায় এই মডেলে। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ে এই উপাদানগুলি কে প্রভাবিত করে। এই মডেলের প্রধান বিষয়গুলি হল জ্ঞাপন এর সাফল্যের জন্য যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন তাহলো প্রেরক এবং গ্রহীতা দু'জনকেই একটা সাধারণগ্রাহ্য মাত্রা বুঝতে হবে। দুঃখের কথা বললে বুঝতে হবে দুঃখ এবং আনন্দের বিষয় কে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

David Berlo ১৯৬০ সালে এই মডেলটির অবতারণা করেন। জ্ঞাপনে তিনি চারটি উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলি হল উৎস (source), বার্তা (message), মাধ্যম (channel) এবং গ্রহীতা (receiver)। Berlo র মতে মাধ্যমের কাজ পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন হয়। এগুলি হল দেখা (seeing), কানে শোনা (hearing), স্পর্শ (touching), গন্ধ (smelling) এবং স্বাদ (testing)। উৎস এবং গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব-এর ব্যাপারে বার্লো বলেছেন বিশেষ কতগুলি বিষয় জড়িয়ে রয়েছে এক্ষেত্রে। এগুলি হল জ্ঞাপন দক্ষতা (Communication skills), দৃষ্টিভঙ্গি (attitude), জ্ঞান (Knowledge), সামাজিক অবস্থা (Social system) এবং সংস্কৃতি (Culture)। বার্তার ক্ষেত্রেও কতগুলি বিষয় বিবেচিত হয়, এবং এগুলি আবার তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই বিষয়গুলো হলো উপাদান (Element), গঠন (Structure), বিষয়বস্তু (content), প্রয়োগ (treatment) এবং সংকেত (code)।

মডেলটির রূপ হলো এই রকম :

S----------M----------C----------R

বিস্তারিতভাবে বললে মডেলটি হবে:

উৎস----------বার্তা----------মাধ্যম----------গ্রহীতা প্রভাব

জ্ঞাপন দক্ষতা	উপাদান	দেখা	জ্ঞাপন দক্ষতা
দৃষ্টিভঙ্গি	গঠন	শোনা	দৃষ্টিভঙ্গি
জ্ঞান	বিষয়বস্তু	স্পর্শ	জ্ঞান
সামাজিক অবস্থা	প্রয়োগ	গন্ধ	সামাজিক অবস্থা
সংস্কৃতি	সংকেত	স্বাদ	সংস্কৃতি

Berlo তার মডেল এর মধ্যে দিয়ে মনস্তাত্ত্বিকও, সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যে বার্তা পাঠাচ্ছে এবং যে গ্রহণ করছেন দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল প্রভাব বিস্তার করছে জ্ঞাপন ক্রিয়ার ওপরে। Berlo র সবচেয়ে বড় অবদান হলো প্রভাব (effect) এর পর্যালোচনা। তার বক্তব্য ছিল শ্রোতা এবং দর্শকের ওপরে প্রত্যেক কোন না কোন প্রভাব আছে। সে প্রভাব ইতিবাচক অর্থাৎ আনন্দের হতে পারে। আবার নেতিবাচক অর্থাৎ দুঃখের হতে পারে।

৩.৩.৩ শ্যানন ওয়েভার মডেল (Shannon Weaver Model)

১৯৫৯ সালে C.E Shannon এবং Warren Weaver জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে একটি মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। এই দুজনেই ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। নিউইয়র্ক এর বেল ল্যাবরেটরীতে ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তারা এই মডেলটি তৈরি করেন।

এতে রয়েছে তথ্যের উৎস (Source of information), প্রেরক (transmitter), গ্রহীতা (receiver) এবং সবশেষে রয়েছে গন্তব্য স্থল (destination)। এদের মতে জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে বাম দিক থেকে ডান দিকে। একদম

বাঁদিকে থাকছে তথ্যের উৎস, তারপর থাকছে প্রেরক, তারপর গ্রহীতা এবং একেবারে ডানদিকে থাকছে গন্তব্য স্থল। প্রেরকের থেকে সংকেত যাচ্ছে গ্রহীতার কাছে তারপর তা চলে যাচ্ছে গন্তব্যস্থলে।

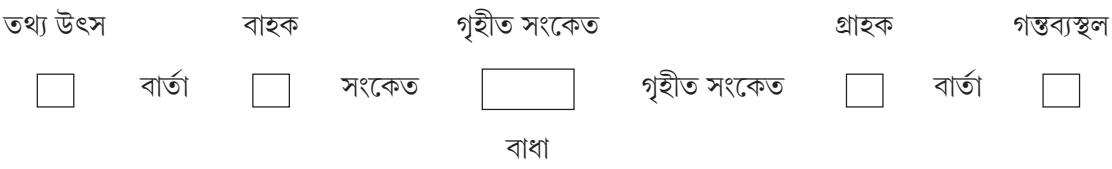

প্রথমে তথ্যের উৎস থেকে প্রেরকের কাছে বার্তা আসছে। এরপর প্রেরক ঠিক করছেন কীভাবে সেই বার্তা প্রেরিত হবে। মাধ্যম নির্বাচন করে তিনি বার্তা পাঠাচ্ছেন। প্রেরকের মাধ্যমে বার্তা সংকেতের রূপ পাচ্ছে। সংকেত পাছেন গ্রহীতা এবং এরপর তা গন্তব্যস্থলে চলে যাচ্ছে। বার্তা পাঠাবার সময় সংকেত এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাধা বা নয়েজ। গ্রহীতা এই নয়েজ যুক্ত সংকেত পান। এই সংকেত অনিবার্যভাবে বিকৃত হয়। প্রেরক চাইছেন না কিন্তু নয়েজ তৈরি হচ্ছে। এতে সংকেত বুঝতে অসুবিধা হয়।

প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বিবেচনা করেই এই মডেল তৈরি হয়েছে। প্রযুক্তি বার্তা প্রেরণের চরিত্র পাল্টে দিয়েছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে নয়েজ। টেলিফোনে বেতারে বার্তা প্রেরণের সময় ফ্রিকোয়েন্সিতে নয়েজ তৈরি হতে পারে। যেমন ফ্রিকোয়েন্সিতে যদি কোনো তারতম্য ঘটে তাহলে তৈরি হতে পারে নয়েজ। এটা হল technical নয়েজ। আবার ঘটতে পারে Semantic নয়েজ। গ্রহীতা বার্তা বুঝতে পারছে না। কারণ ভাষা, সংস্কৃতি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বক্তা যা বলতে চাইছেন শ্রোতা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে ঘটে Semantic Noise। জাপানি ভাষা না জানলে একজন ভারতীয় জাপানির কথা বুঝতে পারবেন না।

অনেক সময় কথাবার্তা ও আলোচনার সময় এইরকম বাধার সৃষ্টি হয় লেখা ও ছবির ক্ষেত্র এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে।

উপরের ছবিতে C হচ্ছে প্রেরক এবং বার্তা যাচ্ছে A এর কাছে। A হচ্ছে অডিয়েন্স যে বার্তাটি গ্রহণ করছে। প্রেরকের কাছে বার্তা ছাড়ার পর নয়েজ তৈরি হচ্ছে। মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যখন বার্তা শ্রোতার কাছে পৌঁছায় তখন আবার তার মধ্যে নয়েজ থাকছে। শ্রোতার কাছে বার্তা কতটা বোধগম্য হচ্ছে তা বিবেচনা করে শ্রোতার বা অডিয়েন্সের শ্রেণী বিভাজন করা যায়। নিচের ছবিতে বিষয়টা এভাবে উপস্থিত করা যায়।

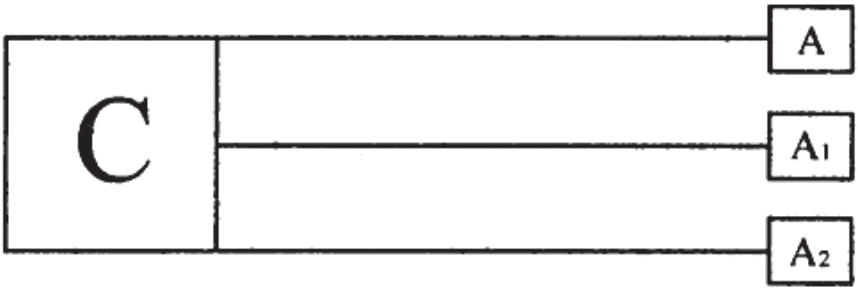

Noise মাধ্যমে

এখানে আমরা দেখাচ্ছি অডিয়েন্স বা শ্রোতা তিন ধরনের- A, A1, A2। C or communicator যে বার্তা পাঠাচ্ছ তা A পরিস্কারভাবে বোঝে। A1 কিছুটা বোঝে আর A2 কিছুই বোঝেনা। তিন শ্রেণীর শ্রোতার কাছে একই বক্তব্য তিন ভাবে উপস্থিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি সভায় বক্তা যা বলছেন, একশ্রেণীর শ্রোতা তা ভালোভাবে বুঝতে পারেন। কিছু শ্রোতা কিছুটা বুঝতে পারেন আবার কিছু শ্রোতার কাছে বক্তব্য একেবারে বোধগম্য নাও হতে পারে।

মাধ্যমের মধ্যে কতখানি নয়েজ আছে তার ওপর নির্ভর করছে কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে। যে বুঝবে তার প্রতিক্রিয়া হবে এক রকম আর যে বুঝবে না তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে অন্যরকম। প্রতিবার্তার বিষয়টি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে প্রতিক্রিয়ার চরিত্র। কমিউনিকেটর বুঝতে পারবেন তার পাঠানো বার্তার প্রতিক্রিয়া এবং সৃষ্টির ক্ষমতা আদৌ ঠিক কতটা।

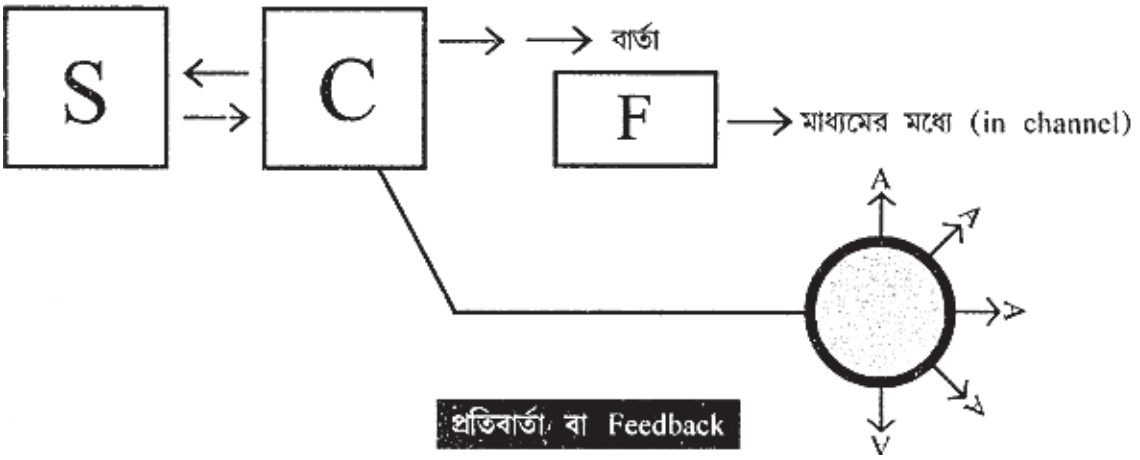

ছবিতে বিভিন্ন রকমের প্রতিবার্তা দেখানো হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রোতার কাছে একটি বার্তা নানাভাবে উপস্থিত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী প্রতিবার্তার তারতম্য ঘটছে। A হচ্ছে মাধ্যমের মধ্যে অপর যে কমিউনিকেটর যা জ্ঞাপন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। অনেক সময় দেখা যায় এই অতিরিক্ত মাধ্যম প্রভাবের জন্য বার্তা অন্য মাত্রা পায় এবং শ্রোতার কাছে এই মাত্রা অন্যভাবে বার্তাকে উপস্থিত করে তাই একই বার্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রোতার কাছে পৌঁছায়।

৩.৩.৪ দে ফ্ল্যার মডেল (DeFleur Model)

Melvin Lawrence De Fleur এই মডেলটি Shannon Weaver এবং Westley Maclean মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিলেন। প্রেরক থেকে গ্রাহক এবং পুনরায় গ্রাহক থেকে প্রেরকের মধ্যে যে বৃত্তাকার জ্ঞাপন চলে তাকেই ব্যাখ্যা করে এই মডেল।

Mass media device এর কথা উল্লেখিত হয়েছে এই মডেলে। এই মডেল বৃত্তাকারভাবে চলে। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছে গ্রহীতার কাছে। আর গ্রহীতা তার প্রতিক্রিয়া প্রতিবার্তার আকারে প্রেরকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এভাবেই

চলছে বৃত্তাকার প্রক্রিয়া। এখানে আমরা পাই দ্বিমুখী প্রতিবার্তা প্রক্রিয়া (two way feedback process)। প্রেরক একটি বার্তা পাঠান সেই বার্তা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সমন্বিত প্রতিবার্তা পাঠিয়ে দিল। এই প্রতিবার্তা পেয়ে প্রেরক আবার বার্তা পাঠাচ্ছে এভাবেই চলছে বৃত্তাকার জ্ঞাপন।

Shannon Weaver মডেল একমুখী জ্ঞাপন-এর কথা বলেছে। সেখানে নয়েজ এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Westley এবং Maclean মডেল দ্বিমুখী জ্ঞাপন এর কথা বলেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই মডেলের সর্বপ্রথম Linear Feedback-এর কথা উল্লেখ করা হলো। বার্তা শুধু প্রতিবার্তা তৈরি করছে না নতুন, প্রেক্ষিতে প্রেরকের কাছে ফিরে আসছে এবং তৈরি করছে আবার নতুন প্রেক্ষিত, যা বারবার তার চেহারা বদলে দিচ্ছে। বৃত্তাকারে চলছে এই জ্ঞাপন। এই মডেলের নয়েজ থাকছে কেন্দ্রে। যে কোনো পর্যায়ে নয়েজ ঘটতে পারে।

De Fleur destination কে জ্ঞাপন এর স্বতন্ত্র পর্যায় বলে বর্ণনা করেছেন।

De Fleur এর আরও একটি সুপারিশ হল জ্ঞাপন এ থাকবে ফিডব্যাক ডিভাইস, এই ডিভাইস এর লক্ষ্য শ্রোতাকে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করে। যে কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রমে লক্ষ্য শ্রোতার গুরুত্ব অপরিসীম (target audience)। সাধারণ শ্রোতার যে লক্ষ্য শ্রোতার গুরুত্ব অনেক বেশি। এই অবস্থায় সহজেই অনুমেয় লক্ষ্যশ্রোতা যে প্রতিবার্তা পাঠাবে তা জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে আরও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ফিডব্যাক এবং টার্গেট অডিয়েন্স। যে বার্তা যাচ্ছে এবং যে প্রতিবার্তা তৈরি হচ্ছে এবং সেই প্রতিবার্তা ফিরে এসে আবার পুনরায় বার্তা কে যেভাবে গড়ে তুলছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞাপনে এই মডেলের প্রাসঙ্গিক তা বেশি।

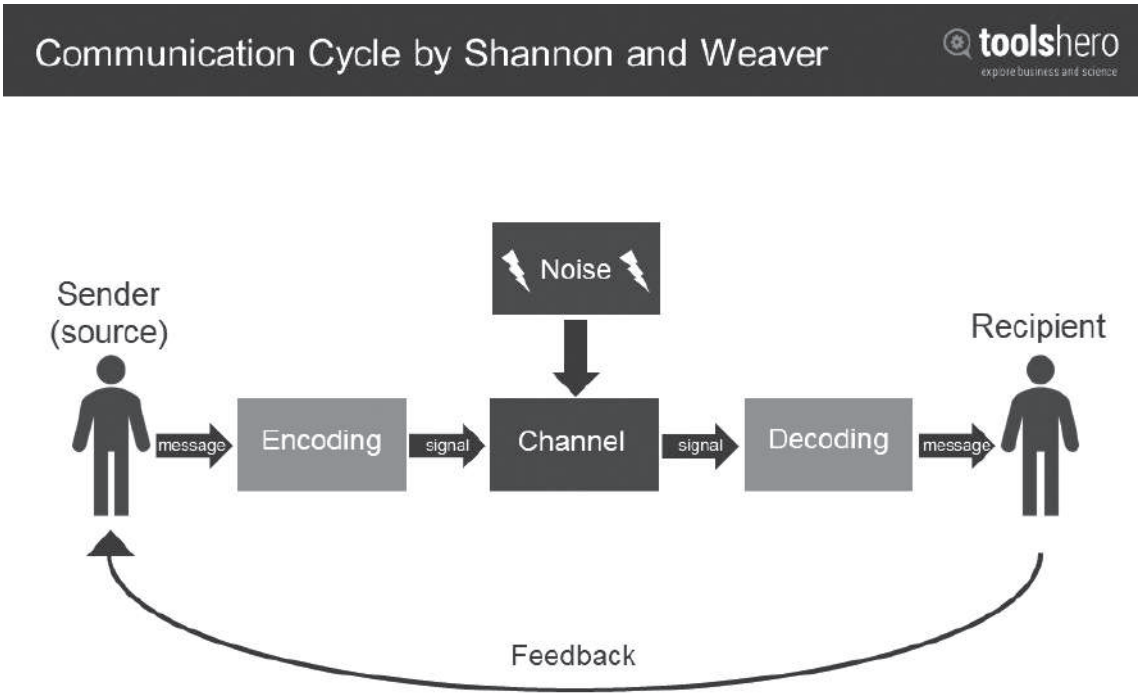

৩.৩.৫ দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল

দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র একেবারে পাল্টে যায়। শুরু হয় দ্বিমেরু রাজনীতি অথবা বাইপোলার পলিটিক্স। আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী দেশগুলির জোট বাঁধে। রাশিয়া নেতৃত্বে ইউরোপের দেশগুলি নিয়ে তৈরি হয় সমাজতান্ত্রিক শিবির। শুরু হয় ঠান্ডা যুদ্ধ। যার ভিত্তি মতাদর্শের লড়াই। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধ গোটা বিশ্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই জটিল অবস্থায় গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা জনগণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ও গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। মানুষের মতামত বোঝার জন্য Paul Lazarsfeld, Bernerd Berelson এবং Hazel Gaudet গবেষণা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই তৈরি হয় দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব (Two step flow theory)। তাঁরা Elihu Katz এর সঙ্গে যৌথ গবেষণায় গণমাধ্যমের প্রভাবকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। বুলেট তত্ত্বকে অস্বীকার করে তৈরি করেন দ্বি-স্তর তত্ত্ব। বুলেট তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যা মিডিয়া বলবে তাই মানুষের মনে বুলেটের মতো গেঁথে যাবে। Lazarsfeld রা দেখলেন গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি বুলেটের মতো জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে না। গণমাধ্যমের বার্তা প্রথমে যাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। তারপর তা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থাৎ গণমাধ্যমের বার্তা দুটি স্তর পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে যাচ্ছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। যেমন শিক্ষক ডাক্তার উকিলরা গণমাধ্যমের বার্তাকে ব্যাখ্যা করছেন সাধারণ মানুষের কাছে। এই ব্যাখ্যার যথেষ্ট প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের উপরে। নির্বাচনের সময় বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। ওপিনিয়ন লিডাররা সাধারণ ভোটারদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেন। এখানে সাধারণ জনগণ Passive হয়ে যায়। ওপিনিয়ন লিডাররা যা বলেন তার দ্বারা প্রভাবিত হন। এই তথ্য কিন্তু সমালোচনার উর্ধে নয়।

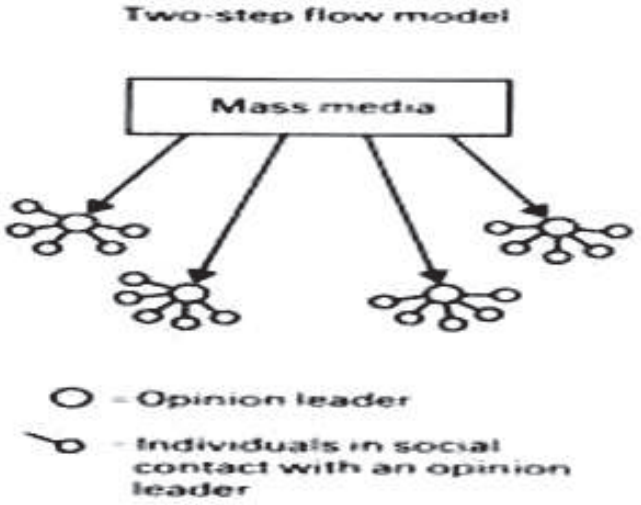

Deutschman ও Danielson বলেছেন যে দ্বি-স্তর তত্ত্ব কিন্তু শেষ কথা হতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে তার কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও মানুষের আচরণকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারে না। সবসময়ই গণমাধ্যম এর তথ্য ওপিনিয়ন লিডারদের মারফত হয় না। অনেক সময় সরাসরিও পৌঁছে যায়।

উপরন্তু Everett Roger's এর Difusion of Innovation তত্ত্ব একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে দুই তৃতীয়াংশ মানুষ জানাচ্ছেন তারা গণমাধ্যমের দ্বারাই সচেতন হয়েছেন। ফেস টু ফেস জ্ঞাপন এর কোন ভূমিকাই সেখানে ছিল না।

৩.৩.৬ সারাংশ

এই পর্যায়ে যে মডেলগুলো আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বার্লো মডেল, শানোন ওয়েভার মডেল, দ ফ্লোর মডেল এবং কাটজ এবং লাজারফেল্ডের দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব। বার্লো জ্ঞাপন ক্রিয়ায় যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল জ্ঞাপন দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি। এগুলি জ্ঞাপনে যুক্ত মানুষদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শানোন ওয়েভার জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় একটি অতিরিক্ত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিষয়টি হলো noise, যা প্রতিনিয়ত জ্ঞাপন কে প্রভাবিত করে। এর ফলে একটি অভিনব মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই noise এর জন্য শ্রোতারা কোন বিষয়কে একেক রকম ভাবে দেখে। কেউ বোঝে, কেউ সামান্য বোঝে, আবার কেউ কিছুই বোঝেনা।

দ ফ্লোর যে মডেলটির অবতারণা করেন তার ভিত্তি ছিল বার্লো এবং শ্যানন ওয়েভার মডেল। দ্য ফ্লোর একটি বৃত্তাকার জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় উল্লেখ করেছেন যা বার্তায় আসা-যাওয়া কে উল্লেখ করে। একটা দ্বিমুখী প্রতিবার্তা প্রক্রিয়া ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। এই প্রক্রিয়ায় noise থাকছে কেন্দ্রে। সুতরাং যে কোন পর্যায়ে এই noise একটা বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

এরপর আসে কাটজ এবং লাজারফেল্ড এর দ্বিস্তর প্রবাহ তত্ত্ব। এই দুই জ্ঞাপনবিদ মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই মডেলটি তৈরি করেছিলেন। এই গবেষণায়ে ওপিনিয়ন লিডাররা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। লাজারফেল্ড-এর গবেষণার প্রধান বক্তব্য ছিল গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছয় না। ওপিনিয়ন লিডাররের মাধ্যমে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই হল দ্বিস্তর প্রবাহ। প্রথমে প্রবাহ আসছে ওপিনিয়ন লিডারদের কাছে। তারপর তা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। কাটজ পারস্পরিক জ্ঞাপন-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ওপিনিয়ন লিডার এবং সাধারণ মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ দ্বিস্তর প্রবাহ তত্ত্বকে শক্তিশালী করেছিল।

৩.৩.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দ্বি-স্তর প্রবাহ কী?

২. বার্লো মডেলটি সংক্ষেপে লিখুন?

বড় প্রশ্ন

১. শ্যানন ওয়েভারের মডেলে অতিরিক্ত কী বিষয় পাই?

২. দে ফ্লার মডেলটি ব্যাখ্যা করুন?

৩. কার্জ এবং লাজারফেল্ডের মডেলটি আলোচনা করুন?

৩.৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলভিন এল দা ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) গণজ্ঞাপন : ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ৪ ◘ নিউকম্ব মডেল, ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল, ডান্স মডেল

গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ নিউকম্ব মডেল

৩.৪.৩ ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল

৩.৪.৪ ডান্স মডেল

৩.৪.৫ সারাংশ

৩.৪.৬ অনুশীলনী

৩.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- নিউকম্ব মডেল
- ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল
- ডান্স মডেল

৩.৪.২ নিউকম্ব মডেল (NewComb Model)

লাসওয়েল, গার্বনার, শ্যানন ওয়েভার যে মডেলগুলির অবতারণা করেছিলেন তা ছিল প্রধানত রৈখিক মডেল। কিন্তু থিওডোর নিউকম্ব যে মডেল দিলেন তার চরিত্র আগের মডেলগুলো থেকে একেবারে আলাদা। সামাজিক প্রেক্ষায় তিনি জ্ঞাপন এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক সম্পর্ক জ্ঞাপনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এটা প্রমাণ করাই ছিল নিউকম্ব মডেল এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মডেল বলে সমাজে ভারসাম্য রাখতে জ্ঞাপন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। A এবং B হল যথাক্রমে প্রেরক ও গ্রহীতা। প্রেরক ও গ্রহীতার ভূমিকায় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান পরিচালন গোষ্ঠী এবং জনগণও থাকতে পারে।

X হল প্রেরক এবং গ্রহীতার সামাজিক পরিবেশ। ABX হলো একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

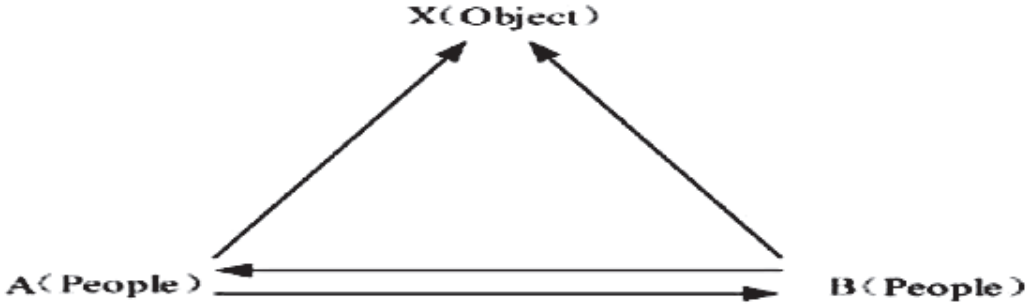

যদি A পরিবর্তিত হয় তাহলে X এবং B ও পরিবর্তিত হবে। অন্যভাবে বলা যায় এ যদি এক্স এর সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলায়, তাহলে B ও X এর সঙ্গে সম্পর্কও বদলাতে হবে। এর অর্থ এবং দুয়ের মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্ব যা X কে প্রভাবিত করছে। লক্ষ্য করতে হবে এর মধ্য দিয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। আবার এমনও হতে পারে A কে পছন্দ করে X কিন্তু B কে করে না। এমন অবস্থায় A এবং B কি অনেক ভেবেচিন্তে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এই যোগাযোগের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে X এর সঙ্গে সহমত বজায় রেখে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। X এর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা পর্যন্ত A এবং B কে নিজেদের মধ্যে জ্ঞাপন চালাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ A হতে পারে ব্যাংক কর্মচারীদের ইউনিয়ন। B হতে পারে সরকার এবং X সরকারি নীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। যেমন ব্যাংকের বেসরকারিকরণ। যদি A এবং B পরস্পরকে পছন্দ করে তাহলে X সম্পর্কে একমত হওয়ার জন্য তারা সহজেই আলোচনা চালিয়ে সহমতে আসার চেষ্টা করবে। আবার A এবং B এর মধ্যে যদি ভালো সম্পর্ক না থাকে তাহলে X সম্পর্কে সহমত হবার জন্য A এবং B মধ্যে প্রয়াস নিতে হবে। আলোচনার মাধ্যমেই সহমতের সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে হবে। ভারসাম্য বজায় রাখাই হল প্রধান লক্ষ্য। নিউকম্ব মডেল এই ভারসাম্য রক্ষার ওপরে বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৩.৪.৩ ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল (Westley and MacLean Model)

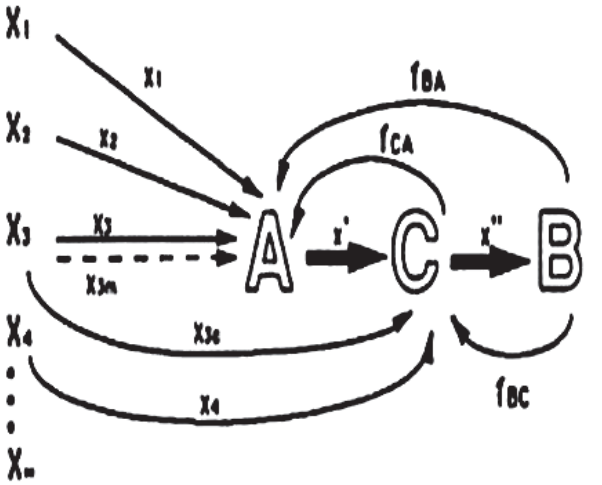

B.H. Westley এবং M.M. MacLean ১৯৫৭ সালে এই মডেলটি পরিবেশন করেছিলেন। জ্ঞাপন কী এবং তার মধ্যে যে আন্তঃ সম্পর্ক আছে তা প্রমাণ করাই ছিল এই মডেলটির উদ্দেশ্য। মডেলটিকে ABX মডেল বলে বর্ণনা করা হয়। যেখানে X হলো বিষয়, A হল প্রেরক এবং B হল গ্রহীতা।

বিভিন্ন উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে A নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বার্তা তৈরি করছে। তারপর সেই বার্তা পাঠাচ্ছে B কে। B বার্তা গ্রহণ করে প্রতিবার্তার মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। এই প্রতিবার্তা তৈরীর সময় B এর মনস্তাত্ত্বিক গঠন প্রতিবার্তাকে প্রভাবিত করছে। X বিষয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে উঠে আসছে উপাদান। অর্থাৎ সূত্রের ক্ষেত্র এখন অনেক বড়। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন উপাদান। এই উপাদান গুলোর সাহায্যে A এক বিশেষ আর্থসামাজিক অবস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে বার্তা তৈরি করে। জার্মান দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন সমস্ত কিছুই আমরা দেখি আমাদের ধ্যান-ধারণা দিয়ে (We see everything with our own perception)। কান্টের মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। A বার্তা তৈরীর সময় X1, X2, X3 এবং X4 সূত্র থেকে উপকরণ নিচ্ছে। তারপর নিজের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী এইসব উপকরণকে বার্তা তৈরীর কাজে লাগাচ্ছে। আবার B এই বার্তা গ্রহণ করছে নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রেক্ষিতে। A এবং B এর ধারণা ও বিচার বুদ্ধি উঠে আসছে পরিবেশ থেকে। B কতটা পরিবর্তিত হবে তা নির্ভর করছে B- এর নিজস্ব ধারণার ওপরে। XB হলো B এর নিজস্ব ধারণা সূত্র। A এর মত B আরো কিছু সূত্র রয়েছে। এই সূত্র গুলি B এর গ্রহণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ থেকে উঠে আসা XB সূত্রগুলি নির্ধারণ করে B এর প্রতিবার্তা কী রকম হবে। এই প্রতিবার্তা A যেমন চাইছে সেরকম নাও হতে পারে। B এর কাছ থেকে যে প্রতিবার্তা আসছে তা হল FBA, এই FBA বিচার করলে বোঝা যাবে B কিভাবে A-র বার্তা গ্রহণ করছে। এবং সেই বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে B-র মধ্যে।

পরে এই মডেলে C কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। C গেটকিপার এর ভূমিকা নেয়। জ্ঞাপনবিদ লিউইন (Lewin) C কে নিয়ে আসেন গেটকিপারের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। গণমাধ্যমের দ্বারা যে জ্ঞাপন হচ্ছে সেখানে C এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের প্রসার যত ঘটছে তত C এর অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রতিবার্তা A সরাসরি যায় না। C এর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে হয়। B এর প্রতিবার্তা যায় C এর কাছে। তারপর তা চলে যায় A এর কাছে।

৩.৪.৪ ডান্স মডেল (Dance Model)

ফ্রাঙ্ক ডান্স (Frank Dance) ১৯৬৭ সালে এই মডেলটি উপস্থাপন করেছিলেন। ডান্স এর বক্তব্য ছিল জ্ঞাপন সর্বদাই মানবিক। জ্ঞাপন যদি মানবিক হয় তাহলে তা কখনই থামে না। চক্রাকারে চলতে থাকে। ডান্স বলেছেন এই বিরামহীন প্রক্রিয়া চলতে থাকে চক্রাকারে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে।

এই মডেলে ডান্স দেখিয়েছেন জ্ঞাপন এর কোন নির্দিষ্ট শুরু বা শেষ নেই। চক্রাকারে জ্ঞাপন প্রক্রিয়া চলে। নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে জ্ঞাপন ক্রিয়া আবদ্ধ থাকে না। এখন যা ঘটছে তার সঙ্গে আগে ঘটে যাওয়া জ্ঞাপন এর যোগ রয়েছে। ঠিক একইভাবে বর্তমান জ্ঞাপন ক্রিয়া ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে চক্রাকারে পিছিয়ে নিচের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে নেমে এসেছে।

জ্ঞাপন সবসময়ই খুব সহজ সরল ব্যাপার নয়, নানান বিষয় প্রভাবিত করে জ্ঞাপনক্রিয়াকে। জ্ঞাপনের গতি এই জটিলতাকে প্রতিষ্ঠা করে। এটি প্রমাণ করে যে ক্রিয়া সর্বদাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। প্রতি স্তরে জ্ঞাপন উন্নত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে। একটি জ্ঞাপন থেকে উদ্ভূত হচ্ছে অন্য একটি জ্ঞাপন এর ধারা। এভাবেই চলছে জ্ঞাপন এর ধারাবাহিকতা।

৩.৪.৫ সারাংশ

এই পর্যায়ে যে মডেলগুলো আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিউকম্ব মডেল, ডান্স মডেল, ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল।

৩.৪.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নিউকম্ব মডেল বলতে কী বোঝেন?

২. ডান্স মডেলটি কোন সালে পরিবেশিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য কী?

বড় প্রশ্ন

১. ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেলটি আলোচনা করুন?

২. নিউকম্ব মডেলটি ব্যাখ্যা করুন?

৩. ডান্স মডেলটি বিশ্লেষণ করুন।

৩.৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৬) Mass Communication Theory : Denis McQuail

একক ১ ◘ ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব (Magic Bullet Theory), ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

গঠন

৪.১.১ উদ্দেশ্য

৪.১.২ ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব (Magic Bullet Theory)

৪.১.৩ ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

৪.১.৪ সারাংশ

৪.১.৫ অনুশীলনী

৪.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব (Magic Bullet Theory)
- ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

৪.১.২ ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব (Magic Bullet Theory)

SR মডেল থেকে উঠে এসেছে ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জ্ঞাপন-এর বার্তা বুলেটের মত বিদ্ধ করে শ্রোতাদের। S অর্থাৎ সেন্ডার পাঠাচ্ছে R-কে অর্থাৎ রিসিভার-কে, এবং এই বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করছেন গ্রহীতা। এই হচ্ছে বুলেটের মতো বিদ্ধ হওয়া। হাইপোডার্মিক নিডেল মডেলের সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই প্রোপাগান্ডা তৈরি হয়েছিল। যে-কোনো রাজনৈতিক বিষয়কে প্রচার করাই ছিল প্রপাগান্ডার উদ্দেশ্য। বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তি (Axis Power) এবং মিত্র শক্তি (Alied Power) যে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে ছিল তার মূলে ছিল এই বুলেট তত্ত্ব।

১৯৩০ সালে বিখ্যাত চিত্র নির্মাতা Orson Wells একটি ফেক নিউজ বুলেটিন তৈরি করেন। এই সংবাদ বুলেটিনে বলা হয় নিউ জার্সিতে এলিয়েনরা আক্রমণ করবে। The War of Worlds নামে একটি বেতার অনুষ্ঠানে এই ফেক

নিউজ টি সম্প্রচারিত হয়। সম্ভবত মোট ১২ মিলিয়ন মানুষের কাছে খবরটি পৌঁছে ছিল। এর মধ্যে ৯ মিলিয়ন মানুষ খবরটি বিশ্বাস করেছিল। এরপর হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল সারাদেশে। বুলেট তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এই ঘটনাটিতে। শোনামাত্রই কিছু মানুষ বিশ্বাস করছে। মানসিক স্তরে বুলেটের মতো বিদ্ধ হয়েছে।

১৯৩৮ সালে লাজারফেল্ড এবং হারটা হার্যোগ (Lazarfeld and Harta Hurzog) এই বুলেট নাটকের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। ওদের সিদ্ধান্ত ছিল এই সম্প্রচার আমেরিকান মানুষের মধ্যে একটা প্যানিক নিঃসন্দেহে তৈরি করেছিল। তবে বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাস করেনি। অল্প কিছু মানুষ বিশ্বাস করেছিল।

১৯৪০ সালে লাজারফেল্ড 'People's Choice' নামে যে বইটি লেখেন সেখানে তিনি ম্যাজিক বুলেট তত্ত্বকে স্বীকার করেননি। বরং তিনি গণমাধ্যম বাহিত বার্তার চেয়ে পারস্পারিক জ্ঞাপন এর মধ্যে দিয়ে যে বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছয় তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

বুলেট তত্ত্বের মূল বিষয় হলো মানুষের মানসিক গঠনে সরাসরি প্রতিক্রিয়া তৈরি করা। মনস্তত্ত্বের আচরণবাদী স্কুলের ধারণা অনুযায়ী এই সম্পর্ক হলো সরলরৈখিক সম্পর্ক যা কেবলমাত্র উদ্দীপক এবং প্রত্যুত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। গণমধ্যম বার্তার মধ্যে দিয়ে উদ্দীপনা তৈরি করছে। বার্তা পাবার পর মানুষ উদ্দীপিত হচ্ছে, এর অর্থ প্রভাবিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে এই তত্ত্বের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। প্রথমে লাজারফেল্ড প্রমাণ করেছেন এর সীমাবদ্ধতা। তিনি গণমাধ্যম-এর চেয়ে পারস্পরিক জ্ঞাপন-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এখন জ্ঞাপনে অনেক মাত্রা যোগ হয়েছে। জটিল সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। তবে বুলেটে তত্ত্ব SR সম্পর্ককে তুলে ধরে একটা নতুন মাত্রা সংযোজন করছিল সন্দেহ নেই। SR সম্পর্কে অনেক জটিলতা এসেছে, নানান বিষয় এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। তবে এখনো কিন্তু এর গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েই কাজ করতে হয়।

৪.১.৩ ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব (Uses and Gratification Theory)

ব্যবহার (Uses)

মানুষের কাছে গণমাধ্যমের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছে। এমনি এমনি তো কোন কিছু জনপ্রিয় হতে পারে না। নিশ্চয়ই কারণ আছে। এই কারণের মধ্যে অন্যতম হল গণমাধ্যম, যা ব্যবহার করে মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং একই সাথে সন্তুষ্টিও পেয়েছে। এই ব্যবহার সন্তুষ্টির বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব Uses and Gratification Theory)।

সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশন এর ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে মানুষের কাছে। ছোটবেলা থেকেই গণমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে মানুষ পরিচিত। এর মাধ্যমে জানা, শেখা উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

গণমাধ্যম ব্যবহারের সুফল এবং কুফল দুটি দিকই আছে। গণমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ যখন শিক্ষিত হয়, আলোকিত হয়, তখন সেটা সুফল। আর শিশুরা যখন টেলিভিশন দেখে হিংসার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন সেটি হল কুফল। প্রতি ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই থাকে।

গণমাধ্যমের ব্যবহার তিনটি স্তরে হতে পারে-

১) ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার

২) পারিবারিক স্তরে ব্যবহার

৩) প্রকাশ্য স্তরে ব্যবহার

মানুষ যখন নিজের প্রয়োজনে গণমাধ্যম ব্যবহার করে তখন হলো ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার। যেমন কেউ একা রেডিওতে গান শুনতে পারে। আবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে বসবার ঘরে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান দেখতে পারে। প্রথমটা ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার এবং দ্বিতীয় টির ক্ষেত্রে ঘটছে পারিবারিক স্তরে ব্যবহার। আবার অনেক সময় প্রকাশ্যে ব্যবহার ঘটে। যেমন সিনেমা দেখা, অডিটোরিয়ামে গিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনা ইত্যাদি।

ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মোবাইলে, আইপ্যাডে নিজের পছন্দমাফিক ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। গান শোনা, সিনেমা দেখা, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার, ইনস্টাগ্রাম অনেক কিছুই করা যেতে পারে। বোতাম টিপে ইচ্ছেমতো ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে মানুষ।

সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি (Gratification)

মাধ্যম ব্যবহার মানুষকে তৃপ্তি এনে দেয়। মাধ্যম ব্যবহারের মধ্যেই তৃপ্তির ব্যাপারটা রয়েছে। সংবাদপত্র সাময়িক পত্র পড়ে এবং বেতার ও টেলিভিশন দেখে মানুষ তৃপ্তি পায়। তবে মাধমে অনুযায়ী তৃপ্তির রকমফের হয়। সংবাদপত্রের পাঠকের তৃপ্তি প্রয়োজনমুখী। সংবাদপত্র পাঠ করে মানুষ জানছে, তার কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটছে। সংবাদ পাঠ করে মানুষ আরো বেশি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন মেটানো এখানে মুখ্য, একেবারে প্রয়োজনমুখে তৃপ্তি।

সাময়িক পত্র পাঠ করে যে তৃপ্তি মানুষ পায় তার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে উপযোগী হলেও এক ধরনের আলস্যের সম্ভাবনা সেখানে থাকে। দ্রুত তাড়াতাড়ি পাড়ার চাপ সেখানে থাকে না, ধীরে ধীরে অলস সময়ে পড়ার সুযোগ থাকে। ফিচার, কলম ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল রচনা পাঠ করে মানুষ আনন্দ পায়। উপভোগের মাত্রা অন্যরকম হয়। এখানে তৃপ্তির চেহারাটা আলাদা।

বেতার ও টেলিভিশনে তৃপ্তির ক্ষেত্র অনেক বড়। বেতার ও টেলিভিশন এই দুই মাধ্যমে পরিবেশিত অনুষ্ঠান বেশি তৃপ্তি দেয়। গান, নাটক, সিরিয়াল দ্রুত মানুষের মন জয় করতে পারে। বেতার ও টেলিভিশন হলো প্রচলিত বিনোদন মাধ্যম। যেখানে বিনোদনের সুযোগ বেশি, সেখানে তৃপ্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। সিনেমা মানুষকে আনন্দ দেয়, তৃপ্তি মেটায়। গানে, কথায়, অভিনয়, গল্পের বুনোটে, ক্যামেরার অভিনব ব্যবহারে, দর্শক এক অন্য জগতের সন্ধান পায়।

Stuart Hyde গণমাধ্যম থেকে উদ্ভূত তৃপ্তির ওপর গবেষণা চালিয়ে ৩১ ধরনের তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। এই তৃপ্তি গুলোকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। এগুলি হল :

১) প্রতিনিধিমূলক

২) পলায়নী প্রবৃত্তি

৩) আত্মিক ও নৈতিক

প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য তৃপ্তি হলো নিজের মনের মত নায়ক বা নায়িকা দেখা। পলায়নী প্রবৃত্তির একটি তৃপ্তি হলো নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়া। আত্মিক ও নৈতিক তৃপ্তি হলো মন্দের পরাজয় এবং যা ভালো তার জয়র দেখতে চাওয়া।

তৃপ্তির উৎস রয়েছে উপভোগ করার মধ্যে। কীভাবে উপভোগ করছে মানুষ সেটা জানা গেলেই বোঝা যাবে তৃপ্তি কেমন হয়েছে। গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক হবার আগে মানুষের মধ্যে যে ধারণা, মূল্যবোধ থাকে তার তৃপ্তি পাবার বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি উন্নত মানের রচনা বা শিল্পকর্মকে যেভাবে উপভোগ করবে একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি সেভাবে করবে না। শিক্ষা রুচির তারতম্য তৃপ্তি পাওয়ার বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের অবস্থান, শিক্ষা, স্বভাব, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তৃপ্তি পায়। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠন তৃপ্তি পাবার সম্ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কেউ উচ্চাঙ্গসংগীত শুনে আনন্দ পেতে পারে আবার অন্যজন লোকসংগীত শুনে অশেষ তৃপ্তি পায়।

আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করি। এই উপভোগ করার মধ্যেই আছে তৃপ্তির উৎস। কীভাবে, কতখানি উপভোগ করছি তাই নির্ধারণ করবে তৃপ্তির মাত্রা।

৪.১.৪ সারাংশ

এই মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব এবং ব্যবহার ও সন্তুষ্টি তত্ত্ব। বুলেট তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জ্ঞাপন এর বার্তা বুলেটের মতো করে শ্রোতাদের বিদ্ধ করে। এই তথ্যকে ভিত্তি করেই প্রোপাগান্ডা তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তবে এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা আছে। বর্তমানে কেউই কোন কিছু সরল বিশ্বাসে মেনে নেয় না। মানুষের মন চলে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় কী গ্রহণ করতে হবে, আর কী বর্জন করতে হবে।

মানুষের কাছে গণমাধ্যম আজ ভীষণ জনপ্রিয়। এর মূলে আছে গণমাধ্যম এর কার্যকারিতা। মানুষ সংবাদপত্র পাঠ করছে। টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখছে, সেখানকার অনুষ্ঠান দেখে জানার পরিধি বাড়াচ্ছে। এটাই হলো কার্যকারীতার পরিচয়। এছাড়া গণমাধ্যমের কাছ থেকে মানুষ যা পায় তা তাকে সন্তুষ্ট করে। এই সন্তুষ্টির ব্যাপারটা আছে বলেই মানুষের কাছে গণমাধ্যম প্রয়োজনীয়। মাধ্যম ব্যবহার ও সন্তুষ্টির বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ব্যবহার ও সন্তুষ্টি তত্ত্ব (uses and gratification theory), Sturd Hyde গবেষণা করে 31 ধরনের তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। তার মধ্যে বেশ কয়েকটিকে তিনটি শ্রেণীতে আবার ভাগ করেছিলেন। উপভোগ করার মধ্যে রয়েছে তৃপ্তির উৎস। শিক্ষার তারতম্য অনুযায়ী তৃপ্তি পাওয়ার ব্যাপারটা আলাদা হয়। তৃপ্তি পাওয়ার বিষয়টি সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের যোগ রয়েছে।

৪.১.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব কী?

২. সন্তুষ্টি তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন?

বড় প্রশ্ন

১. ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন। বর্তমানে এই তত্ত্বটি কি প্রাসঙ্গিক?

২. ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করুন?

৪.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৪) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) The Mass Media and Modern Society : William Riker, T. Paters on, J. W. Jensen

একক ২ ◘ স্পাইরাল অফ সাইলেন্স (Spiral of Silence), জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব (Cognitive Disonnance Theory)

গঠন

৪.২.১ উদ্দেশ্য

৪.২.২ স্পাইরাল অফ সাইলেন্স (Spiral of silence)

৪.২.৩ জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব (Cognitive Disonnance Theory)

৪.২.৪ সারাংশ

৪.২.৫ অনুশীলনী

৪.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.২.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- স্পাইরাল অফ সাইলেন্স (Spiral of silence)
- জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব (Cognitive Disonnance Theory)

৪.২.২ স্পাইরাল অফ সাইলেন্স (Spiral of Silence)

গণজ্ঞাপন এর একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হোলো স্পাইরাল অব সাইলেন্স। এই তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান Elisabeth Noelle Neumann, যিনি 'পাবলিক ওপিনিয়ন অরগানাইজেশন' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন জার্মানিতে।

এই তত্ত্বের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। যে কোন জ্ঞাপনে অডিয়েন্স পার্টিসিপেশন একটি অপরিহার্য শর্ত। মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া জ্ঞাপন কখনোই সম্ভব হতে পারে না। Elizabeth Noelle Neumann দেখালেন জ্ঞাপন এর ক্ষেত্রে ভয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছে। জ্ঞাপনে মানুষ সক্রিয় থাকছে কিন্তু ভয়ে কথা বলছে না। এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটি হলো অডিয়েন্স কখনো কখনো নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে চায়না, ভাবে তাহলে তারা আইসোলেশন এ চলে যাবে।

Silence এই অবস্থায় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। Dance প্রবর্তিত মডেলের অনুরূপ ছবি এখানেও পাওয়া যায়। আলোচনার টেবিলে অনেক মানুষকে দেখে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু মানুষ কিন্তু নিরুত্তর থেকে যাচ্ছে। তাদের ভয় সংখ্যাগরিষ্ঠের

দাপট কে। সবার থেকে আলাদা হয়ে যাবার এই ভয় তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ঐ কারণে তারা চুপ থাকে। এই ভয়ে তৈরি করে স্পাইরাল যা ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকে তার মানে কথা ফুরিয়ে যায় ক্রমশ। কথাবার্তায় নেমে আসে নিস্তব্ধতা।

এ অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা কথা বলেই চলে, আর সংখ্যালঘিষ্ঠরা চুপ মেরে যায় ভয়ে। আইসোলেশনে চলে যাওয়ার রিস্ক তারা নিতে চায় না। জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ১৯৩০ সালে ওয়াল্টার লিপম্যান একটি বই প্রকাশ করেছিলেন, নাম 'পাবলিক ওপিনিয়ন'। এই বইটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল স্পাইরাল অব সাইলেন্স তত্ত্বটির ওপর। জনমত গঠনে গণমাধ্যমের যে সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছিলেন লিপম্যান তার সঙ্গে জনমতের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। গণমাধ্যম যা বলছে তার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে। মানসিকভাবে যে-কোনো বিষয় সম্পর্ক গড়ে তুলছে তার সুস্পষ্ট মতামত। এখানে গেট কিপিং এর বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে উঠছে। কোন বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রাধান্য পাবে সেটা ঠিক হচ্ছে এই পর্যায়ে। নির্বাচিত খবরই পরিবেশিত হয় এবং এই খবর জনমত গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাবলিক স্ফিয়ারে যখন গণমাধ্যম পরিবেশিত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে তখন আপামর সমস্ত মানুষই কিন্তু এক মত থাকে না। মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য থেকে যায়। পার্থক্যের বিভাজনে একদল থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্য দল থাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ। পাবলিক স্ফিয়ার সংখ্যালঘুর মত প্রকাশের ব্যাপারে সংকুচিত হয়। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা আস্থা সহকারে নিজেদের মত প্রকাশ করে। সেখানেই সংখ্যালঘিষ্ঠরা চুপ করে যায়। তাদের মধ্যে এই বোধ হয় যে তারা মত প্রকাশ করলে বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেটেড হয়ে যাবেন। সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ভয়ে তাদের কুরে কুরে খায় এবং তারা নীরব হয়ে থাকে।

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় দেখা গেছে এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে এড়িয়ে চলতে চায় মানুষ। এটা হয় ভয় থেকে। তিনি বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত যদি ভুল হয়, এবং তারা সেটা জানলেও, চুপচাপ থেকে একটা সম্মতির বার্তা দেন। কারণ সবার সঙ্গে তারা আছেন এই বিষয়টা তাদের স্বাচ্ছন্দ দেয়।

Ellsabets Noelle Neumann's Spiral Silence

৪.২.৩ জ্ঞানীয় ও অনৈক্য তত্ত্ব (Cognitive Disonnance Theory)

এই তথ্যটির ভিত্তি হলো মনস্তত্ত্ব বা সাইকোলজি। মানুষের মনের সমীকরণ হল এই তত্ত্বের প্রধান প্রেরণা। মানুষের জানার মধ্যে অনৈক্য Disonnance থাকে। যে সিগারেট খায় সে জানে সিগারেট খেলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সিগারেট খেলে শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে। তবুও সে এই কথাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তার মনে হয় সিগারেট না খেয়েও তো অনেকে ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে। এই যে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে মনের ভেতর থেকে, এটাই হলো Dissonance বা অনৈক্য।

১৯৬০ সালে Leon Festinger নামে একজন আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ এই কগনিটিভ থিওরি অফ কমিউনিকেশনের রূপরেখা দেন। তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মানুষ অনেক সময়ই দুটি বিপরীত ধর্মী বিশ্বাস রাখে একই সময়ে, আর তখনই সংগঠিত হয় কগনিটিভ ডিসোনান্স। এর ফলে তৈরি হয় ওই ব্যক্তির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ বা Stress।

এই চাপকে অতিক্রম করার জন্য দরকার মানসিক শক্তি। সবসময় তা অর্জন করা যায় না। এইজন্যই মানুষ ধূমপান ছাড়তে পারে না। মদিরা আসক্তিকেও দূর করতে পারেনা। যারা পারে তাদের মানসিক জোর অনেক বেশি। তারা এই অনৈক্য কে পেরিয়ে ঐক্যের দিকে এগিয়ে যায়।

বিষয়টি খুবই জটিল। যে দুটি বিপরীত ধারণা থাকে, তার মূল্য যাচাই করা প্রয়োজন। মানুষ চায়, এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাতে সে স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে।

Cognitive Dissonance এর ক্ষেত্রে চারটি তাত্ত্বিক প্যারাডাইম লক্ষ্য করা যায় এগুলি হল Believe disconfirmation, Induced compliance, Free choice এবং Effort Justification.

Forbidden behaviour paradigm, একটি নেতিবাচক পরীক্ষা মডেল। Elliot Aronson এবং J.M Carl smith অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের উপর একটি সমীক্ষা করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাচ্চারা কতটা নিজেদের বিচার বুদ্ধি নিয়ে পরিচালিত হয় তা খতিয়ে দেখা। এ হচ্ছে Belive disconfirmation পর্ব।

বেশ কিছু ছোট ছেলে মেয়েকে একটা ঘরে আটকে রাখা হলো। এই ঘরে প্রচুর খেলনা রাখা আছে। বাচ্চাদের বলে দেওয়া হল কোদাল জাতীয় খেলনা না স্পর্শ করতে। যদি তারা এই খেলনা নিয়ে খেলে তাহলে শাস্তি পাবে।

Induced Comsliance পর্বে বাচ্চাদের বলা হলো তারা যেকোন খেলনা নিয়ে খেলতে পারে। কোনো বাধা-নিষেধ নেই। এবার দেখা গেল অধিকাংশ বাচ্চাই ওই কোদালের ধারে কাছে যাচ্ছে না। আদতে বিষয়টা কিছু জনের মাথায় ঢুকে গেছে যে কোদাল ছাড়াও অনেক কিছুই খেলার জন্য আছে। শুধু শুধু এই কোদাল নিয়ে খেলার ঝামেলায় কেন যাব! এটা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে সবাই চায় একটা সেফ বা সুরক্ষিত জায়গায় থাকতে, এবং জ্ঞাপনেও এই স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে চায়।

Freechoice হলো আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যা কগনিটিভ ডিসনান্স বা জ্ঞানীর অনৈক্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কোনটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য এটা ঠিক করা খুবই কঠিন, যদি আমার সামনে অসংখ্য পছন্দের সম্ভাবনা রাখা হয়। এ বিষয়ে ১৯৫৬ সালে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এই সমীক্ষার নাম ছিল পোস্ট ডিসিশন চেঞ্জ প্রোবাবিলিটি অ্যান্ড এবিলিটি অফ অল্টারনেটিভ। একবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কিছু সমস্যা তৈরি হয় সেটাই প্রমাণিত হয়েছিল এই সমীক্ষায়।

অন্য দলের সদস্যদের সঙ্গে তাদের সামান্য দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। যেটা করছি সেটা খারাপ হলেও যারা করছি তারা প্রত্যেকে আমাদের কাছের লোক। এটাই হলো এ পার্ট অফ জাসটিফিকেশন। নিজ উদ্যোগে সমর্থন প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। Cognitive Dissonance অথবা জ্ঞাপন এর অনৈক্যের একটা বড় দৃষ্টান্ত।

আরেকটি উদাহরণ রাখা যেতে পারে। আমরা যারা মাংস খাই তারা আবার বন্যপ্রাণীর প্রতি গভীরভাবে ভালোবাসা পোষণ করি। প্রাণীকে হত্যা করেই মাংস খাচ্ছি, আবার প্রাণীদের ভালোবাসি। দুটোই সত্য কিন্তু বিপরীতধর্মী। গবেষকরা একে বলেছেন Meet Paradox. Hank Rosenberg বলেছেন এই বিপরীতধর্মী ক্রিয়া তৈরি করছে অনৈক্য। চেতনার অগ্রগতি হয় এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে।

৪.২.৪ সারাংশ

এই এককে আলোচিত হয়েছে স্পাইরাল অব সাইলেন্সে এবং জ্ঞানভিত্তিক অনৈক্য তত্ত্ব।

স্পাইরাল অব সাইলেন্সে তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন এলিজাবেথ নোয়েল নিউম্যান, তিনি ছিলেন একজন জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। গবেষণা করে তিনি দেখেছিলেন ভয়ে মানুষ অনেক সময় চুপ করে থাকে। সত্য জেনেও অনেক সময় তা বলতে ভয় পায়। কারণ তখন মানুষ নিজেকে সংখ্যালঘু ভাবে। তার মনে হয় সত্য কথা চললে সে হবে একা। এই ভয় তাকে নীরব রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দাপটের সামনে সংখ্যালঘু মানসিকতা কণ্ঠরোধ করে আপনা আপনি। বাইরে থেকে নয় ভিতরে তাগিদেই সে চুপ করে যায়। এই ভয়ে তৈরি করে স্পাইরাল যা ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকে।

Cognitive Dissonance তত্ত্ব যাকে বাংলায় বলা হয়েছে জ্ঞানীয় (জ্ঞানভিত্তিক) অনৈক্য তত্ত্ব, তার ভিত্তি হলো মনস্তত্ত্ব। মানুষের ভয় হল এই তত্ত্বের প্রধান প্রেরণা। মানুষের জানার মধ্যে অনৈক্য থাকে। এর অর্থ বিপরীতমুখী ভাবনা মানুষের চেতনার কাজ করে। এর ফলে তৈরি হয় চাপ যা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন মানসিক শক্তি যেটা সব সময় মানুষ অর্জন করতে পারে না। এই কগনিটিভ ডিসনান্স-এর ক্ষেত্রে চারটি তাত্ত্বিক প্যারাডাইম লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল Believe disconfirmation– Induced compliance– Free choice এবং Effort Justification।

৪.২.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্পাইরাল অব সাইলেন্সে তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন?

২. জ্ঞানীয় অনৈক্য তত্ত্ব কী?

বড় প্রশ্ন

১. স্পাইরাল অব সাইলেন্স তত্ত্বের সঙ্গে কি মনস্তত্ত্বের যোগ রয়েছে?

ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

২. কগনিটিভ ডিসনান্স তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করুন।

৪.২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narmla

২) Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

একক ৩ ◻ উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব (Agenda Setting Theory), সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist Theory), অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (Other Related Theories)

গঠন

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

৪.৩.২ উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব (Agenda Setting Theory)

৪.৩.৩ সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist Theory)

৪.৩.৪ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব (Other Related Theories)

৪.৩.৫ সারাংশ

৪.৩.৬ অনুশীলনী

৪.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব (Agenda Setting Theory)
- সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist Theory)
- অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব (Other Related Theories)

৪.৩.২ উপস্থাপনা বিন্যাস তত্ত্ব (Agenda Setting Theory)

গণমাধ্যম-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্যতম হল কোন বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপিত হবে তার বিন্যাস করা। কোন বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপিত হবে তার খুঁটিনাটি যাচাই করা। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন সকল গণমাধ্যমকেই উপস্থাপনা বিন্যাসের কাজটি করতে হয়। ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটগুলোকেও বিষয় বেছে নিতে হয়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং নিউজ পোর্টালগুলিতে কি পরিবেশিত হবে তা আগে থেকে ঠিক করতে হয়। বিষয় নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াকে বলে উপস্থাপনা বিন্যাস। উপস্থাপনা বিন্যাসের চরিত্র অনুধাবন করলেই বোঝা যায় কোন মাধ্যম কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

এই তাত্ত্বিক ধারণার উদ্ভব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) উপস্থাপনা বিন্যাসের প্রাথমিক রূপরেখা দিলেও ধারণাটি প্রথম সার্থক রূপ পায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্নাড কোহেনের (Berner Cohen) গবেষণায়। তিনি দেখেছিলেন সংবাদপত্র কী নিয়ে মানুষ চিন্তা করবে তা ঠিক করে দেয়। তার বক্তব্য ছিল সব সময় মানুষ কী চিন্তা করবে তা হয়তো সংবাদপত্র ঠিক করতে পারে না, কিন্তু পাঠক কে বলে দেয় কী বিষয় নিয়ে চিন্তা করা দরকার।

বাস্তব জগৎ মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। এই বিষয়টি নির্ভর করে অনেকাংশেই কীভাবে বাস্তব ঘটনা মানুষের কাছে উপস্থিত হচ্ছে ঠিক তার ওপর। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র পড়ে মানুষ যা জানছে, প্রকৃতভাবে তাই গড়ে তুলছে তার ভাবনার আধার। যুদ্ধ নিয়ে বেশি সংবাদ যদি প্রকাশিত হয় তাহলে যুদ্ধই মানুষকে বেশি ভাবাবে। আবার করোনার মত ভাইরাস আক্রমণ নিয়ে বেশি কভারেজ থাকলে করোনা ভাইরাস নিয়ে সে চিন্তা করবে।

বিষয়ে উপস্থাপনা বিন্যাস নিয়ে মূল্যবান আলোচনার সূত্রপাত করেন ১৯৭২ সালে Maxwell McCombs এবং Donald Shaw, ১৯৬৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ঠিক কি ছিল! সেটা বুঝতে তারা একটি ছোট্ট সমীক্ষা চালান। নর্থ ক্যারোলিনার চ্যাপল হিল অঞ্চলের মানুষদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশন সংবাদে কী প্রভাব ফেলেছিল সেটাই তারা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন গণমাধ্যম কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিচ্ছিল, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মতামত জানার চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের প্রশ্ন ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে? আশ্চর্যের বিষয় গণমাধ্যম দ্বারা নির্বাচিত বিষয়ে এবং সাধারণ মানুষ উত্তরে যা বলেছিলেন তার মধ্যে সামাঞ্জস্য ছিল। দেখা গেল গণমাধ্যমের এজেন্ডা আর সাধারণ মানুষের এজেন্ডা একই ছিল। McCombs এবং Shaw এর প্রচেষ্টা গণজ্ঞাপন গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। পরবর্তীকালে বহু গবেষক বিষয় উপস্থাপন বিন্যাস নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রজার্স, শুমেকার এর গবেষণা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৮৮ সালে রজার্স এবং শুমেকার এর গবেষণায় উপস্থাপনা বিন্যাসের তিনটি দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একটি হলো মাধ্যম সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস (Media Agenda Setting), দ্বিতীয়টি হল জনমত সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস (Public Agenda Setting) এবং তৃতীয়টি নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস (Policy Agenda Setting)। মাধ্যমের ক্ষেত্রে দেখা যায় কীভাবে গণমাধ্যম এর বিষয়বস্তু নির্বাচিত হচ্ছে। পাঠকের চাহিদা, পছন্দ ও প্রতিষ্ঠান নীতি পর্যালোচনা করে ঠিক হয় কী বিষয়ের উপর কাজ করা হবে। সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর সম্পাদকরা হলেন গেটকিপার। তারা পেশাগত নৈপুণ্যের দ্বারা ঠিক করেন কী বিষয়ে গণমাধ্যমে—সংবাদপত্রে ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পরিবেশিত হবে।

প্রতিদিন প্রচুর সংবাদ এসে জমা হয় নিউজ ডেস্ক-এ। বার্তা সম্পাদক তার মধ্যে থেকে অল্পকিছু সংবাদ বেছে নেন পরিবেশনার জন্য। সম্পাদকীয় ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হারোল্ড লাসওয়েল তার গবেষণায় এই মাধ্যম উপস্থাপনা বিন্যাসের ওপরই জোর দিয়েছিলেন। জনমত অনুধাবন করতে সাধারণ মানুষের চাহিদা পছন্দের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জনগণের পছন্দ ঠিক করে দেয় কোন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকরা

জনমত সমীক্ষা চালিয়ে খুঁজে পান বিষয়গুলিকে। কিছু প্রশ্ন নিয়ে তারা উপস্থিত হন সাধারণ মানুষের কাছে। উত্তরের মধ্যে থেকে উঠে আসে নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাসের দিশা।

নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস হল সেই প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে সরকারের নীতি এবং নেতৃবর্গের বর্ণিত নীতি কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে তার আভাস পাওয়া যায়। আইন সভায় প্রণীত আইন, বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতির মাধ্যমে এই বিন্যাসের চরিত্র অনুধাবন করা যায়। এই তিনটি বিন্যাস পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি বিন্যাস একে অপরকে প্রভাবিত করে। বিষয়টিকে এই ভাবে সাজানো যায়:

মধ্যম সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস------জনমত সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস-------নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস।

এটা এখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে উপস্থাপনা বিন্যাস ও জনমত সম্পর্কিত উপস্থাপনা বিন্যাস জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনমতের দ্বারা মজবুত হয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বেতার ও টেলিভিশন প্রতিদিন যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করছে সেগুলি গভীরভাবে প্রভাবিত করছে মানুষের চিন্তা-ভাবনা। গণমাধ্যম যদি সরকারের দুর্নীতি, ব্যর্থতা নিয়ে খবর করে মানুষের মনে তার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারি। গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশনে পরিবেশিত বিজ্ঞাপন ভোগের ইচ্ছা মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। প্রতিমুহূর্তে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। আধুনিক সমাজের এই পরিবর্তনে গণমাধ্যমের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। উপস্থাপনা বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে গণমাধ্যম পরিচালকরা সমাজ পরিবর্তনের গণমাধ্যমকে আরো সক্রিয় করে তুলছে। শুমেকার এবং রজার্স গবেষণা করে দেখেছেন সাংবাদিকদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ও পেশাগত দক্ষতা সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

বিষয় উপস্থাপনা বিন্যাস সামাজিকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস ও নীতিবোধ গড়ে তুলতে টেলিভিশন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা আজ প্রমাণিত। উলফ এবং ফ্রিস্ক তার গবেষণায় দেখিয়েছেন গণমাধ্যম কীভাবে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

টেলিভিশন দেখে তারা শেখে, নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখে নেয়। এই ভাবেই তৈরি হয় তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। টেলিভিশনে যদি হিংসা, স্বার্থপরতা দেখানো হয় তার প্রভাব শিশুদের ওপরেও পরে। তাদের সামাজিকরণ প্রভাবিত হয়।

গণমাধ্যমের সঙ্গে সংস্কৃতির যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে তার মূলেও রয়েছে উপস্থাপনা বিন্যাস। গণমাধ্যম এর বিষয় সমাজ সংস্কৃতি চেতনায় রূপান্তর ঘটাচ্ছে। ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা ভোগবাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, এগুলি সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। মানুষ যা পড়ছে, শুনছে এবং দেখছে তাই দিয়েই বিচার করছে সবকিছু। কী পড়বে, কী শুনবে, কী দেখবে এবং তারপর কী ভাববে এই গোটা প্রক্রিয়াটি নির্ধারণ করছে উপস্থাপনা বিন্যাস। গণমাধ্যম-এর মালিকানায় যত কেন্দ্রীভবন ঘটছে সমাজ সংস্কৃতির ওপর একচেটিয়া মালিকানার আধিপত্য তত বাড়ছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে তৈরি হচ্ছে বিষয়ে উপস্থাপনা বিন্যাসের রূপরেখা। এটা গভীর উদ্বেগের বিষয়। বৈচিত্রের সম্ভাবনার ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

৪.৩.৩ সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist Theory)

কাল মার্কস এবং এঙ্গেলসের সাম্যবাদী ভাবনা কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গণমাধ্যম সম্পর্কিত সাম্যবাদী তত্ত্ব। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সমাজ পরিবর্তনের যে রূপরেখা দিয়েছে তার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে শ্রেণী সংঘাত, যা প্রকৃতপক্ষে মানবিক আচরণের প্রতিফলন ছাড়া কিছুই নয়। মার্ক্স বলেছেন মানবিক আচরণ সর্বদাই সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে ধাবিত হয়। মানুষ সর্বদাই চেষ্টা করে উন্নততর সামাজিক অবস্থায় পৌঁছতে। এর জন্য সে নিরন্তর সংগ্রাম করার জন্য তৈরি থাকে। এই সংগ্রামকে তিনি শ্রেণীসংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন।

শোষক আর শোষিতের মধ্যে সংগঠিত শ্রেণীসংগ্রাম সূচনা করে সমাজ রূপান্তরের। সমাজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র, তারপর সমাজতন্ত্র। এরপর উত্তরণ ঘটবে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায়। এই হল মাক্সবাদী দর্শন এর মূল কথা। এই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় জ্ঞাপন হয়ে ওঠে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় উৎস রয়েছে সমাজেই। মানুষের যৌথ সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা। মানবিক আচরণ তাকেই প্রকাশ করে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিবাদী আচরণ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণী প্রচলিত ব্যবস্থাকেই ধরে রাখতে চায় নিজেদের স্বার্থে। পুঁজিপতিরা গণমাধ্যম এর মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন গণমাধ্যম হলো সামাজিক উপরিকাঠামো। বৃহৎ সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং বর্তমানে ইন্টারনেট নির্ভর সোশ্যাল সাইট গুলি পুরোপুরি পুঁজিপতি শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রচলিত মূল্যবোধকে ধরে রাখা এই গণমাধ্যম গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পুঁজিবাদের কোন অস্তিত্ব থাকে না। সাম্যবাদী ভাবনার পরীক্ষায় শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা চালিত হয় শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী স্বার্থে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় এক চূড়ান্ত মাইলফলক হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় গণমাধ্যম পরিচালিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে। গণমাধ্যম সেই বিষয় পরিবেশন করবে যাতে শ্রমিক কল্যাণ সাধিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু মুক্তবাজার ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না, তাই সেখানে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন থাকে না। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গণমাধ্যম, সংবাদপত্র টেলিভিশন বা বেতার যাই হোক না কেন পরিচালিত হয়। দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। তাই কমিউনিজমের আদর্শেই গণমাধ্যম পরিচালিত হয়।

সাম্যবাদী তত্ত্বের সারকথা হলো শ্রেণীহীন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এই সাম্য শুধু রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয় সাম্যের ধারণা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থাকে সমান ভোটাধিকার কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য থাকেনা। সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী ভাবধারায় সাম্য আর্থ-সামাজিক পরিসরেও বিরাজ করে।

৪.৩.৪ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (Other Related Theories)

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল মার্কস, ফ্রয়েড ও অ্যাঁভাগাদ শিল্প সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই স্কুলের সমাজবিজ্ঞানীরা এক নতুন তাত্ত্বিক রূপরেখা দেন গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ১৯২৩ সালে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট ইনস্টিটিউট অফ সোশাল

রিসার্চ এর সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন। এই দলের নেতা ছিলেন ম্যাক্স হর্কহাইমার, তিনি ছিলেন ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর। তিনি মার্কসবাদের অনুসরণে সমালোচনা তত্ত্বের প্রাথমিক রূপরেখা দেন।

এই স্কুলের প্রবক্তারা ছিলেন বামপন্থী মার্কসবাদী, অন্যদিকে ফ্রয়েডিয়ান। সাহিত্য-শিল্প ও মানবতাবাদ তাদের চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে গোরা বামপন্থী ভাবনা ছিল স্কুলের প্রধান অনুপ্রেরণা।

ফ্রয়েডিয়ান ভাবনার অনুষঙ্গ প্রথম নিয়ে আসেন লিও লোয়েন্থল। তিনি ছিলেন ফ্রয়েডের ছাত্র। Karl Landawer এর অনুগামী। হর্কহাইমারের সহযোগিতায় লান্ডাওয়ের ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে মনঃসমীক্ষণের একটি কেন্দ্র গড়ে তোলেন। মনস্তত্ত্ব চর্চার প্রসার এর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রয়েডীয় ভাবনা ধীরে ধীরে এই স্কুলের সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনীতি, বিশেষ করে হিটলারের সঙ্গে স্ট্যালিনের অনাক্রমণ চুক্তি এই স্কুলের সদস্যদের হতাশ করে। চিরায়ত মার্কসবাদ এর প্রতি বিশ্বাসের ভিত আলগা হয়ে যায়। তাঁরা সোভিয়েত মডেলের মার্কসবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। নয়া মার্ক্সবাদী এই সদস্যরা ক্রমশ ফ্রয়েডিয়ান সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। এরিক ফ্রম এর মতো মার্কসবাদী সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন মার্কবাদ সম্পূর্ণ নয়। সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যাকে সঠিক রূপ দিতে গেলে ফ্রয়েডীয় ভাবনার সাহায্যে নেওয়া প্রয়োজন। ফ্রম মনে করতেন, পরিবার সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানবিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এইভাবেই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সদস্যরা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। মানুষের আচরণ ও সমাজ পরিবর্তন কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গণমাধ্যমের কার্যধারা অনুসরণ করেছেন। হিটলারের মত একনায়ক তৈরি করতে গণমাধ্যমের প্রোপাগান্ডা কীভাবে কাজ করেছে তার বিশ্লেষণ তাঁরা করেছেন। গণমাধ্যম ব্যক্তি মানুষের আচরণ কীভাবে কতটা পরিবর্তন করতে পারে তার ওপর আলোকপাত করেছেন।

শিকাগো স্কুল

মানবিক জ্ঞানচর্চায় শিকাগো স্কুলের ভাবধারার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশ শতকের শুরু থেকেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান চর্চা একের পর এক নতুন প্যারাডাইম তৈরি করে সমাজতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক এবং ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক যথাক্রমে জর্জ সিমেল এবং এমাইল ডুর্ক হেইম শিকাগো স্কুলের চর্চাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯২০ সালের পর থেকে শিকাগো স্কুল এর সদস্যরা সামাজিকীরণ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। বিশেষ করে জর্জ সিমেল এর আধুনিক নগর জীবন চর্চা, বিবর্তনবাদ কেন্দ্রিক ভাবনা, শিকাগো স্কুলের ভাবধারার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাদের দেওয়া তাত্ত্বিক প্যারাডাইম অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব বেড়ে ওঠা অনেকাংশে নির্ভর করে মানবিক জ্ঞাপনের ওপরে। তাদের অভিমত হলো সমাজে বাঁচতে গেলে মানুষকে জ্ঞাপন এর সাহায্য নিতেই হবে। মানবিক আচরণের বিকাশের জৈবিক কারণ আছে। সামাজিক কারণসমূহের ফলিত প্রভাবকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। জ্ঞাপন এর মধ্যে দিয়ে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তথ্য ভাবনার আদান-প্রদান হয়, বাস্তবে সেটাই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের এই দিকটিকে তারা প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism) বলে অভিহিত করেছেন। মানবিক আচরণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। দেখা দেয় সমাজ ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অনুধাবন এর প্রয়োজনীয়তা। ধনি শিল্পপতি জন ডি রকফেলার এর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতান্ত্রিক গবেষণার কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে।

যে গবেষকরা শিকাগো স্কুল এর বিশেষ ধারণাকে গড়ে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আলবিয়ন স্মল (Albion Small), অ্যার্নেস্ট বার্জেস, জন ডিউয়ি (John Dewey), জর্জ হার্বার্ট মিড (George Herbert Mead) এবং রবার্ট ই পার্ক (Robert E Park)। আলবিয়ন স্মল ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। শিকাগো স্কুলে দার্শনিক ধারণা গড়ে তুলতে তার অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্নেস্ট বার্জেস (Arnest Burgess) হলেন আরো একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ। হিউম্যান ইকোলজি নিজে গবেষণা চালিয়েছিলেন। তার প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের নিত্যদিনের সম্পর্কের বিন্যাস। ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

জন ডিউয়ি (John Dewey) ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। ১৮৯৪ থেকে ১৯০৪ তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছিলেন। পরে তিনি চলে যান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শনকে তিনি মিলিয়েছিলেন বাস্তব বিচক্ষণতার সঙ্গে। তিনি মনে করতেন বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করা উচিত তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে। প্রগতিশীল শিক্ষা বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করতে পারে।

জর্জ হারবার্ট মিড ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। সমাজ মনস্তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন তিনি গবেষণা করেছিলেন। তার বিখ্যাত বইটি ছিল মাইন্ড, সেল্ফ এন্ড সোসাইটি (Mind self and society)। মিডের বক্তব্য ছিল মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে জ্ঞাপন এর মাধ্যমে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের মেলামেশা, একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় এবং একে অপরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব।

Robert E Park হলেন গণজ্ঞাপন চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। অনেক বেশি বয়সে তিনি শিক্ষকতা জগতে এসেছিলেন। কিন্তু অতি দ্রুত তিনি স্বীকৃতি পান। সমাজতত্ত্বের আলোচনার সর্বপ্রথম তিনি জাতি সম্পর্কের বিকাশ আলোচনা করেন। গণজ্ঞাপন এবং মানুষের সমষ্টিগত আচরণ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালান। পার্ক শিক্ষা ব্যবস্থায় আসার আগে ছিলেন একজন রিপোর্টার। রিপোর্টিং ছেড়ে তিনি মাস্টার হতে আসেন। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা সমাজতত্ত্বকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন "I have actually covered more ground– trampling about in cities in different parts of the world– than any other living man, out of all these I gained– among other things– a conception of the city– the community– and the region– not as a geographical phenomena merely but as a kind of social organism" তিনি ইউরোপ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা আদিবাসীদের সমাজের উপর গবেষণা চালিয়ে মন্তব্য করেছিলেন অভিবাসীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও কিন্তু মনে প্রাণে মার্কিন সমাজে মিলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পোলিশ, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় যে সমস্ত কাগজ বেরোয় তাদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখেছিলেন সংবাদপত্রগুলি এমনভাবে বিষয় নির্বাচন করতো যাতে পাঠকরা তাদের আঞ্চলিক সত্ত্বা বজায় রেখেও মার্কিন জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে যেতে উৎসাহ পায়। সমাজতত্ত্বের আলোচনায় অধ্যাপক পার্ক যেভাবে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে গণ জ্ঞাপন গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন পার্কই হলেন গণজ্ঞাপন চর্চার প্রথম তাত্ত্বিক। শিকাগো স্কুলের সতীর্থদের সঙ্গে এক সুরে পার্ক বলেন মানবিক জ্ঞাপন সামাজিকরণ প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে।

গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্ব (Media Dependency Theory)

গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্বের উদ্ভব গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শুরুতে। গণমাধ্যম সেই সময় হয়ে উঠেছিল প্রবল শক্তিশালী। ওয়াশিংটন পোস্টের তদন্তমূলক সংবাদ মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। গণমাধ্যমের এই শক্তি সাধারণ মানুষকে গণমাধ্যমের উপর নির্ভর করে তুলেছে। গণমাধ্যম যা লিখেছে তা বিশ্বাস করছে মানুষ। এটাই গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি।

Sandra Ball Rokeach এবং Mevin DeFleur ১৯৭৬ তৈরি করেন গণমাধ্যম নির্ভর তথ্য। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সন্তুষ্টি তত্ত্ব গভীর প্রভাব ফেলেছিল এই গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্বের ওপরে।

গণমাধ্যম, মানুষ ও সামাজিক ব্যবস্থা জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে। এই পারস্পারিক সম্পর্কটা সহজেই বোঝা যায়। গণমাধ্যম এর সাহায্যে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। কারণ তার দেখার, ভ্রমণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু গণমাধ্যম এর জানলা দিয়ে অনেক কিছু দেখা যায়। জানার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত করে। এজন্যই মানুষের গণমাধ্যম নির্ভরতা বেড়েছে।

নির্ভরতার মাত্রা কিন্তু সবসময় একরকম হয় না। নির্ভরতার মাত্রা কিন্তু জড়িয়ে থাকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে। সেগুলি হল যথাক্রমে :

ব্যক্তি: নির্ভরতার মাত্রা ঠিক হয় কী তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি সে গণমাধ্যম এর কাছ থেকে পাচ্ছে তার উপরে। যদি তার সন্তুষ্টি বেশি হয় তাহলে নির্ভরতার মাত্রা বাড়বে। যদি সন্তুষ্টি কম হয় তাহলে নির্ভরতার মাত্রা কমবে।

সামাজিক পরিস্থিতি : সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে গণমাধ্যম নির্ভরতার যোগ রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় দাঙ্গা যুদ্ধ ও নির্বাচনের সময় মানুষের গণমাধ্যম নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন মানুষ অনেক বেশি তথ্য ও ব্যাখ্যা পায় যা তাকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে।

সক্রিয় শ্রোতা : এখানে শ্রোতার মধ্যে গণমাধ্যম যারা ব্যবহার করছেন তারা সকলেই আছেন। এই শ্রোতারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে। যেমন অনেকে গান-বাজনা, নাটক দেখা-শোনার জন্য টেলিভিশন ও বেতার কে ব্যবহার করেন আবার শেয়ারবাজার বোঝার জন্য অনেকে গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করেন।

গণমাধ্যম এর পক্ষ থেকেও এই নির্ভরতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। যেমন গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে বিষয় নির্বাচন করেন। সোজা কথায় শ্রোতাদের চাহিদা রুচি পছন্দ অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। টিভিতে সিরিয়াল রিয়েলিটি-শো তৈরি হয় সম্পূর্ণভাবে শ্রোতাদের পছন্দের কথা ভেবে।

উত্তর আধুনিক সমাজে গণমাধ্যম নির্ভরতা তত্ত্ব কখনোই সমালোচনার ঊর্ধে নয়। শুধুমাত্র গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষ এবং শ্রোতারা এবং সমাজ বিষয়টি ঠিক করছে এমন ভাবাটা অতিসরলীকরণ পর্যায়ে পড়ে। জীবন আজ অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে ও সামাজিক বিন্যাস এর মধ্যে থাকছে বহুমাত্রা, স্তর এবং রং। যেমন পরিবেশ, ফেমিনিজম ,প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর গণমাধম-এ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। গণমাধ্যম ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। নিউ মিডিয়ার আবির্ভাব বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলেছে। অসংখ্য সোশ্যাল সাইট এর জন্য গণমাধ্যম, ব্যক্তি ও সমাজ অন্য মাত্রা লাভ করেছে।

মার্শাল ম্যাকলুহান (Marshall McLuhan)

জ্ঞাপন চর্চায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন মার্শাল ম্যাকলুহান। তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জ্ঞাপন প্রযুক্তি কীভাবে মানুষের ইন্দ্রিয় জাত অনুভবে পরিবর্তন নিয়ে আসছে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম মানুষের সহজাত পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করতে পারে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ম্যাকলুহানের গবেষণা যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল।

মুদ্রণ মাধ্যম দিয়ে ম্যাকলুহান আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তার দাবি ছিল মুদ্রণ মাধ্যম মৌখিক জ্ঞাপনের প্রভাবকে বদলে দিয়েছিল। তথ্য পাওয়া ও বোঝার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এলো তা মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। অক্ষর ও লাইন কে অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষের চিন্তা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরে গিয়ে পাঠ করার যে অভ্যেস তৈরি হলো তা ব্যক্তিগত অনুভব। তা যোগ করেছিল নতুন মাত্রা। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া' সমাজের সঙ্গে গণমাধ্যমে সম্পর্ক কে বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যম চর্চায় যোগ করেছিলো এক নতুন দিকচিহ্ন।

ম্যাকলুহান বলেছেন বর্ণমালা থেকে সকল মাধ্যম মানুষই তৈরি করেছে। কিন্তু তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা মানুষের নিজের সীমাকে সর্বদাই অতিক্রম করেছে। বর্ণমালা থেকে কম্পিউটার মানুষ ও তার পরিবেশকে একই সঙ্গে গভীরভাবে প্রভাবিত এবং রূপান্তরিত করেছে (Because all media, from the phonetic alphabet to the computer, are extensions of man that cause deep and lasting changes in him and transform his environment)।

ম্যাকলুহানের দাবি মানুষ সর্বদাই নিজের আবিষ্কারের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। যন্ত্রের আবির্ভাবে মানুষের সমস্ত রকম ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। হাত দিয়ে যা করা যেত তা ক্রেন এর মাধ্যমে এখন আরও ক্ষিপ্রতার এর সঙ্গে করা সম্ভব হয়েছে। ম্যাকলুহানের বক্তব্য হলো প্রযুক্তি যত উন্নত হয়েছে মানুষের চেতনায় তার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। টেলিভিশনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমের এক সম্প্রচার শুধুমাত্র মানুষকে জানায় না, তার মনোজগতকেও বিপুল ভাবে প্রভাবিত করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিতে নানান সূক্ষ্ম পরিবর্তন নিয়ে আসে। তার অপ্রতিহত এই অসামান্য ক্ষমতা মাধ্যমকেই বার্তা করে তোলে। তৈরি হয় তার সেই প্রবাদপ্রতিম ঘোষণা **'মাধ্যম হল বার্তা' (Medium is the message)**।

ম্যাকলুহান মাধ্যমকে দু'ভাগে বিভাজন করেছেন। একটি হলো ঠান্ডা মাধ্যম অপরটি হলো গরম মাধ্যম। তাঁর কথায় এটা হল কোল্ড মিডিয়া এবং হট মিডিয়া। ঠান্ডা মাধ্যমের শ্রোতা-দর্শকের অংশগ্রহণ অনেক বেশি। মুদ্রণ মাধ্যম, ফটোগ্রাফ, বেতার এবং চলচ্চিত্র হল হট মিডিয়া। আর বক্তৃতা, কার্টুন, টেলিফোন এবং টেলিভিশন হলো কোল্ড মিডিয়া। গরম মাধ্যম হলো হাই-ডেফিনেশন মিডিয়া। কারণ তার মধ্যে উন্নত সেন্সরি ডাটা থাকে। ঠান্ডা মাধ্যমে তুলনায় অনেক লো ডেফিনেশন এবং কম সেন্সারি ডেটা সমৃদ্ধ হয়। ঠান্ডা মাধ্যমে দর্শকদের শ্রোতাদের অনেক বেশি উদ্যোগ নিতে হয়।

প্রযুক্তি গণমাধ্যমকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এর প্রভাব মানুষের চেতনাতেও পড়েছে। ম্যাকলুহান এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। তার এই ভাবনা পরবর্তীকালে জ্ঞাপন চর্চাকে উৎসাহিত ও একইভাবে উন্নত করেছে।

৪.৩.৫ সারাংশ

কীভাবে গণমাধ্যম এর বিষয়ে উপস্থাপিত হবে তার রূপরেখা নির্ধারণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমস্ত গণমাধ্যমকেই এই উপস্থাপনা বিন্যাসের কাজটি করতে হয়। সে সংবাদপত্র বা বেতার অথবা টেলিভিশন যাই হোক না কেন। এরই নাম উপস্থাপনা বিন্যাস ইংরেজিতে বলা হয় এজেন্ডা সেটিং তত্ত্ব। এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

এই ধারণা প্রথম সার্থক রূপ পায় বার্নাড কোহেন এর গবেষণায়। কোহেন দেখেছিলেন সংবাদ মানুষের কাছে উঠে আসছে গণমাধ্যম এর মধ্যে দিয়ে। খবরের কাগজ, বেতার অথবা টেলিভিশন দেখেই মানুষ তার চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। আসল কথা গণমাধ্যমে যা পরিবেশিত হবে তাই মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করবে। বিভিন্ন জ্ঞাপনবিদের গবেষণার এই উপস্থাপনা বিন্যাসের তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গেও এর যোগ রয়েছে। কারণ গণমাধ্যম যেমন সমাজকে প্রভাবিত করে তেমনই সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজবাদী ধারণাও গণমাধ্যমকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কাল মার্কস এবং এঙ্গেলসের সাম্যবাদী ভাবনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গণমাধ্যম সম্পর্কিত সাম্যবাদী তত্ত্ব। সমাজ বিপ্লবের পর যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হয় সেখানেই কার্যকরী হয় সাম্যবাদী তত্ত্ব। গণমাধ্যম এই ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে।

সাম্যবাদী তত্ত্বের সারকথা হলো শ্রেণীহীন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এই সাম্য শুধু রাজনৈতিক মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্য।

অন্যান্য যেসব প্রাসঙ্গিক তথ্য আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। শিকাগো স্কুল, গণমাধ্যম নির্ভর তত্ত্ব ও মার্শাল ম্যাকলুহানের তাত্ত্বিক অবদান।

৪.৩.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উপস্থাপনা বিন্যাস (এজেন্ডা সেটিং) তত্ত্ব কী?

২. সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্বের ভিত্তি কি?

বড় প্রশ্ন

১. উপস্থাপনা বিন্যাস এজেন্ডা সেটিং তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন। আধুনিক গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

২. সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্বে গণতন্ত্রের কতটা পরিপূরক বুঝিয়ে দিন।

৩. ফ্রাংকফুর্ট, শিকাগো স্কুল আলোচনা করুন।

৪.৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory D. McQuail–Sage.

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) ড: গণজ্ঞাপন : ড: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৪) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম- ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

একক ৪ ◘ কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (Cultivation Theory and Analysis)

গঠন

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

৪.৪.২ কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (Cultivation Theory and Analysis)

৪.৪.৩ সারাংশ

৪.৪.৪ অনুশীলনী

৪.৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ার পরে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন

- কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (Cultivation Theory and Analysis)

৪.৪.২ কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (Cultivation Theory and Analysis)

কাল্টিভেশন তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো টেলিভিশনের সামাজিক প্রভাব। সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হল টেলিভিশন। ছোট থেকে বড় সবার চোখ আটকে থাকে টেলিভিশনের পর্দায়। দুশোর ওপর চ্যানেল বর্ণময় পসরা নিয়ে হাজির। রিমোট বোতাম টিপলেই হলো। মন-পছন্দ অনুষ্ঠান একের পর এক চলে আসছে পর্দায়।

নেতিবাচক দিক থেকে টিভির অন্য একটা পরিচয় তৈরি হয়েছে। সেটা হলো বোকা বাক্স। অনেকে বলেছেন টিভি দেখে মানুষের শুধু সময়ের অপচয় হচ্ছে তা নয়, মস্তিষ্কের ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। আবার আরেক দল বলছেন সারাক্ষণ বসে বা শুয়ে টিভি দেখার ফলে মানুষ মোটা হয়ে যাচ্ছে। শারীরিক পরিশ্রম হচ্ছে না, তাই মেদবৃদ্ধি পাচ্ছে। একদল মনে করছেন অবিরাম টিভি দেখার ফলে বাচ্চাদের মনের একাগ্রতা কমছে। দৃশ্যে চাঞ্চল্য তাদের মনকেও চঞ্চল করে তুলছে। প্রচুর অ্যাকশনধর্মী ছবি ছোটদের মধ্যে হিংসা বাড়াচ্ছে এবং নৈতিক মূল্যবোধের পতন ঘটছে। টেলিভিশনের এই বিপুল প্রভাবের পর্যালোচনা করে কাল্টিভেশন তত্ত্ব। টেলিভিশন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে কতটা প্রভাব ফেলছে সেটা যাচাই করে দেখতে চায় এই তত্ত্ব। অধ্যাপক জর্জ গার্বনার ১৯৭৬ সালে দর্শকদের উপরে টেলিভিশন কি প্রভাব ফেলছে তা জানার জন্য গবেষণা চালান। যদিও এই গবেষণাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এর মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্বজুড়েই গুরুত্ব পেয়েছিল।

গার্বনার টেলিভিশনের সামাজিকীরণ এবং ধর্মের সামাজিকীকরণ এর মধ্যে তুলনা করেন।

তিনি টেলিভিশনের সামাজিক ভূমিকাটি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। অতীতে ধর্ম, সমাজ জীবনে যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল টেলিভিশন বর্তমানে সেই কাজটাই করছে। গার্বনার টেলিভিশনের প্রভাবকে দুটি স্তরে ভাগ করেছিলেন। প্রথম স্তর কে First order এবং দ্বিতীয় স্তর কে Second-order বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম স্তরে দেখা যায় টেলিভিশন দেখার ফলে জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম হচ্ছে। যেমন পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য আইন-কানুন মেনে চলা ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তরে দেখা হয় বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে তৈরি হচ্ছে।

গার্বনার কাল্টিভেশন তত্ত্বের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি হল :

ক) অন্যান্য গণমাধ্যম এর চেয়ে টেলিভিশনের প্রভাব বেশি কারণ টেলিভিশন এর বিষয়বস্তু বিচিত্র ও বিপুল। বর্ণময় ছবি এর প্রভাব বাড়িয়ে দেয়। সমাজ সংস্কৃতিতে এর ছাপ পড়ে।

খ) টেলিভিশন মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি বাড়ায় না, বরং মানুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে।

গ) কিছু মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে চলি। টেলিভিশন এগুলিকে পুষ্ট করে এবং ধরে রাখতে উৎসাহ দেয়। সামাজিক স্থিতিশীলতা বাস্তবতা বজায় রাখার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। কখনোই তার বিরোধিতা করে না।

ঘ) দিনে চার ঘন্টার বেশি টেলিভিশন দেখলে মানুষ Mean Word Syndrome এর দিকে ঝুঁকবে। Mean Word Syndrome হল সেই ব্যবস্থা যেখানে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্রয় পায়।

ঙ) টেলিভিশন কখনোই বাস্তবকে প্রতিফলিত করে, না পরিবর্তে এক সৃষ্টিমূলক বাস্তবকে তুলে ধরে। যা দেখানো হয় তাই দেখে মানুষ। এই দেখানো পদ্ধতির মধ্যে যুক্ত হয়ে থাকে অন্য আরও প্রচেষ্টা।

কাল্টিভেশনের তারতম্য :

টেলিভিশন কতটা সময় একজন দেখছে সেটা বিবেচনা করা দরকার। যে অনেকক্ষণ রিয়েলিটি শো দেখে সে ভাবতেই পারে মানুষ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বেশি পোষণ করে এবং নিজেও স্বার্থকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। আবার যে ধ্রুপদী সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতি বেশি দেখে তার মনে হতে পারে মানুষ আনন্দে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। আবার যে কম সময় টেলিভিশন দেখে তার মনে হতে পারে মানুষ সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত। বিভিন্ন বিষয়ে এই কাল্টিভেশন এর তারতম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। বিষয়গুলি হলো অনেকটা এইরকম :

১) **সময় :** কত সময় নিয়ে একজন টেলিভিশন দেখছেন সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। যারা বেশি সময় নিয়ে দেখছেন তারা হলে হেভি ভিউয়ার্স। আর যারা কম সময় দেখছেন তারা হলেন লাইট ভিউয়ার্স।

২) **পরিবেশ :** মানুষ কেমন পরিবেশে আছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা খারাপ পরিবেশে থাকে তাদের মনে হতে পারে সব কিছুই খারাপ। Mean World Syndrome এ আচ্ছন্ন হয়ে তারা টেলিভিশনে খারাপ বিষয়গুলির দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।

৩) মেয়েরা: টেলিভিশনে মেয়েদের কোন বিষয়টি দেখানো হবে এবং কীভাবে তা পরিবেশিত হবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফেমিনিস্টরা বলে টেলিভিশনের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে পুরুষশাসিত সমাজের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের সমস্যা

তুলে ধরে যা প্রকৃত অবস্থা থেকে অনেক দূরে থাকে। তারা অত্যাচারিত, পুরুষ নির্ভরশীল ও অপমানিত হতে থাকে। তাদের অভিজ্ঞতা হয় Mean World Syndrome এর কাছাকাছি।

৪) অনেকের সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখলে কাল্টিভেশন এর প্রভাব কমে, একা দেখলে প্রভাব বাড়ে।

৫) **বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফারাক :** টেলিভিশনের পর্দায় যা উঠে আসে তার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না। এই অভিজ্ঞতা কাল্টিভেশন এর ক্ষেত্র প্রশস্ত করে।

৬) **বয়স :** বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের অভিজ্ঞতা কম থাকে। টিভিতে যা দেখে তাই বিশ্বাস করতে তাদের মন চায়। তাদের মন কল্পনাপ্রবণ, সুন্দর কিছু দেখলে তা বিশ্বাস করতে চায়। সেটা যে সাজানো তা মানতে চায় না। এক্ষেত্রে কাল্টিভেশন এর প্রভাব কম হয়।

বিশ্লেষণ

কাল্টিভেশন তত্ত্বের সমালোচকরা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এর ওপর গুরুত্ব দেন। শুধুমাত্র হিংসা বললে সঠিকভাবে কিছুই বোঝায় না, হিংসারও অনেক ধরন আছে। যেমন কার্টুনে যখন হিংসা দেখানো হয়, তার চরিত্র অনেক হালকা, অন্যদিকে বাস্তবে যখন হিংসা দেখানো হয় তার প্রভাব বহুলাংশে বেশি। বাবা মা সন্তানকে মারছে এমন বহু ছবি ভাইরাল হয়ে উঠে আসে পর্দায়। তখন তার সঙ্গে কার্টুন এর হিংসার অনেক পার্থক্য থাকে।

কাল্টিভেশন তত্ত্বের গবেষণায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কাল্টিভেশন এর প্রভাব মাপার ওপরে। শুধুমাত্র কাল্টিভেশন এর মাপ দিয়ে টেলিভিশনের প্রভাব এর সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় না। যে সমস্ত দর্শক প্রভাবিত হচ্ছে তাদের মানসিক গঠনের ওপরে আগে থাকতেই অন্য কিছুর প্রভাব থাকতেই পারে। একেবারে পরিষ্কার স্লেটের মতন মন নিয়ে তো কেউ টেলিভিশন দেখে না। অনেক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ আগে থাকতেই মনের মধ্যে থাকে। দেখতে দেখতে গ্রহণ-বর্জনের পালা চলতেই থাকে। একটা দুটো ক্ষেত্র সমীক্ষায় মানুষ কী উত্তর দিল তা দিয়ে টেলিভিশনের প্রভাব বিষয়ে সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না। তবে এই গবেষণার মধ্য দিয়ে টেলিভিশন প্রভাবের খণ্ডচিত্র অবশ্যই পাওয়া যায়।

৪.৪.৩ সারাংশ

কাল্টিভেশন তত্ত্ব ও তার বিশ্লেষণ এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কাল্টিভেশন তত্ত্বের মূল বিচার্য বিষয় হল সমাজের উপরে টেলিভিশনের প্রভাব। বর্তমানে টেলিভিশন ভীষণ জনপ্রিয় মাধ্যম। সন্ধের পর মানুষের সব সময় টুকু কেড়ে নিয়েছে টেলিভিশন। প্রাইম টাইম চলতে থাকে একটার পর একটা সিরিয়াল। কখনো আকর্ষণীয় রিয়ালিটি শো। এছাড়া বর্ণময় বিচিত্রানুষ্ঠানতো রয়েছে। এই যে মানুষ টেলিভিশন দেখছে তার একমাত্র কারণ হল টেলিভিশনের বিশাল প্রভাব। এই প্রভাব পর্যালোচনা করার জন্যই তৈরি হয়েছে কাল্টিভেশন তত্ত্ব।

জর্জ গার্বনার টেলিভিশনের প্রভাব জানার জন্য গবেষণা করেন। তিনি জানান আগে ধর্ম সমাজ জীবনে যেভাবে প্রভাব ফেলত বর্তমানে টেলিভিশন সেই কাজটাই করছে। গার্বনার কাল্টিভেশন তত্ত্বের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। কাল্টিভেশন তারতম্যের বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। কাল্টিভেশন

এর প্রভাব মানুষের মনোজগতে বিপুল তরঙ্গ তুলতে পারে। এগুলো বিশ্লেষণ করলে টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমের প্রভাব বুঝতে পারা যাবে।

কাল্টিভেশন তত্ত্বের বিশ্লেষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকগুলো বিষয় উঠে আসে। যেমন হিংসা, কার্টুনে যখন হিংসা দেখানো হয় তার প্রভাব আর বাস্তবে যখন হিংসা দেখানো হয় তার প্রভাব কিন্তু কখনোই এক হয় না। কাল্টিভেশন তত্ত্বে এই বিভাজন খুব অস্পষ্ট। এছাড়া মানুষের মনের মধ্যে আগে থাকতেই যেসব ধারণা রয়েছে তার প্রভাবের কথা কাল্টিভেশন তত্ত্বে পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা শুধুমাত্র ক্ষেত্র-সমীক্ষা দিয়ে কাল্টিভেশন এর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। আরো অনেক জরুরী বিষয় পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

৪.৪.৪ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কাল্টিভেশন তত্ত্ব কী?

২. কাল্টিভেশন তত্ত্ব কি মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে?

বড় প্রশ্ন

১. কাল্টিভেশন তত্ত্ব এবং টেলিভিশনের সম্পর্কটি আলোচনা করুন। এই তত্ত্ব কি গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব কে বেশি গুরুত্ব দেয়? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

২. কাল্টিভেশন তত্ত্বটি উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করুন।

৪.৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) Mass Communication Theory D. McQuail–Sage

২) Communication Theory Today - Edited by David Cowley and Devid Michel

৩) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলদিন এল কি ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা একাডেমি ঢাকা)

৪) গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি - ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)